দাম : ষোলো টাকা

বিরোধীদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা স্পষ্ট করে দিল করমণ্ডল
— পৃঃ ২৩

স্বস্তিকা

বিচারপতি নিয়োগে কলেজিয়াম ব্যবস্থা ও সমকামী বিবাহ— পৃঃ ১৭

৭৫ বর্ষ, ৪৩ সংখ্যা।। ২৬ জুন, ২০২৩।। ১০ আষাঢ় - ১৪৩০।। যুগাব্দ - ৫১২৫।। website : www.eswastika.com

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৫ বর্ষ ৪৩ সংখ্যা, ১০ আষাঢ়, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

২৬ জুন - ২০২৩, যুগাব্দ - ৫১২৫,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ☐ ৫

'গোরু আর অমাত্য' সমান-ই হয়, মমতা চাইলেও ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হবে না ☐ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ☐ ৬

মরছে ওরা মরুক, রাজনীতি থাক লাশনীতিতে ☐ সুন্দর মৌলিক ☐ ৭

ভূগোলভিত্তিক রাজনীতি ক্ষেত্রে তিন ধনুর্ধরের কার্যকলাপ ☐ সঞ্জয় বারু ☐ ৮

চীনকে রুখতে কোমর বাঁধছে ভারত-আমেরিকা ☐ বিশ্বামিত্র ☐ ১০

বদলাচ্ছে আমার দেশ, বদলাচ্ছে মানুষের মন ☐ শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী ☐ ১১

কংগ্রেস শাসনে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা হরণ ☐ ১৪

বিচারপতি নিয়োগে কলেজিয়াম ব্যবস্থা ও সমকামী বিবাহ ☐ সুদীপ নারায়ণ ঘোষ ☐ ১৭

বিরোধীদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা স্পষ্ট করে দিল করমণ্ডল ☐ ড. রাজলক্ষ্মী বসু ☐ ২৩

আমরা রেলমন্ত্রীর পদত্যাগ চাই! ☐ মণীন্দ্রনাথ সাহা ☐ ২৬

তৃণমূলনেত্রীর জেদে পরিকল্পনার একশো বছর পরেও অসম্পূর্ণ ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো ☐ হীরক কর ☐ ২৮

সুপ্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির এক মহান পরম্পরা শ্রীগুরুপূর্ণিমা ☐ মন্দার গোস্বামী ☐ ৩১

অসমের সত্র সংস্কৃতির পীঠস্থান মাজুলী ☐ ড. পূর্ণেন্দু শেখর দাস ☐ ৩৩

ফলিত জ্যোতিষের মাহাত্ম্য ☐ অচিন্ত্যরতন দেবতীর্থ ☐ ৩৪

বুদ্ধদেব গুহর কথাসাহিত্যে দেশ ☐ রঞ্জিত কুমার ভরদ্বাজ ☐ ৩৫

কেন পৃথক উত্তরবঙ্গ চাই ☐ কুণাল চট্টোপাধ্যায় ☐ ৪৩

কুড়ি জুন পশ্চিমবঙ্গের জন্মদিবস ☐ ড. বাবুলাল বালা ☐ ৪৭

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ☐ অঙ্গনা : ২১ ☐ সুস্বাস্থ্য : ২২ ☐ অন্যরকম : ৩৯ ☐ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ☐ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৮-৪৯ ☐ চিত্রকথা : ৫০

প্রকাশিত হবে
৩ জুলাই,
২০২৩

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে
৩ জুলাই,
২০২৩

দাঙ্গা প্রতিরোধে শ্যামাপ্রসাদ

দেশভাগের কিছু আগে থাকতেই শুরু হয়েছিল নির্মম হিন্দু নিধন। জিন্নার ডাইরেক্ট অ্যাকশনের ডাকে ১৯৪৬ সালে কলকাতায় ঘটেছিল গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং। কলকাতার আগুন অচিরেই ছড়িয়ে পড়েছিল কুমিল্লা, নোয়াখালি, ঢাকা, বরিশালে। এই সময় ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় হিন্দু গণহত্যা প্রতিরোধ করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় থাকবে শ্যামাপ্রসাদের সেই ঐতিহাসিক ভূমিকার বিশ্লেষণ। লিখবেন এই সময়ের বিশিষ্ট লেখকরা।

দাম ষোলো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK
Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693
IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

মৃত্যু লইয়া রাজনীতি

করমণ্ডল এক্সপ্রেস ট্রেন দুর্ঘটনা এযাবৎকালের সবচেয়ে বড়ো ট্রেন দুর্ঘটনা। তাহাতে বহু মানুষ হতাহত হইয়াছেন। যে কোনো দুর্ঘটনা অথবা মৃত্যুই অতীব দুঃখের। কিন্তু ভারতের মতো দেশে কোনো দুর্ঘটনা অথবা মৃত্যুকে লইয়াও স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিরা তাহা রাজনীতির বিষয় করিয়া তুলিয়া বাকবিতণ্ডায় মাতিতে বিলম্ব করেন না। দেশের বিপদ অথবা সংকটের দিনে পক্ষ-প্রতিপক্ষ ভুলিয়া একযোগে কাজ করিতে দেখা যায় না। সম্প্রতি করমণ্ডল এক্সপ্রেস দুর্ঘটনার ক্ষেত্রেও তাহার কোনো ব্যতিক্রম ঘটে নাই। একেবারে ব্যতিক্রম ঘটে নাই বলিলে ঠিক হইবে না। একমাত্র ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী তথা ওড়িশা বিজেপির প্রধান রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ নবীন পট্টনায়েক ব্যতিক্রমী ভূমিকা পালন করিয়াছেন। নবীন পট্টনায়েক একমাত্র রাজনীতিক যিনি রেলমন্ত্রক অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের কোনোরূপ সমালোচনা না করিয়া কেন্দ্র-রাজ্য একযোগে দুর্ঘটনাগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়াইয়াছেন। নবীনবাবু ব্যতীত তাবৎ বিরোধী দলগুলি রেলমন্ত্রক তথা কেন্দ্র সরকারের সমালোচনায় মুখর হইয়াছে। তাহাদের ভাবখানা যেন তাহাদের শাসনকালে কোনোদিন ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটে নাই। তাহারা শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই, রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের পদত্যাগও দাবি করিয়াছেন। কিন্তু দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ বিরোধীদের দাবির কোনোপ্রকার সারবত্তা খুঁজিয়া পান নাই। দেশবাসীর সহিত বিশ্ববাসীও এই ট্রেন দুর্ঘটনায় রেল মন্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। করমণ্ডল এক্সপ্রেস দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই যেভাবে ওড়িশা সরকার ও রেলমন্ত্রকের তত্ত্বাবধানে উদ্ধারকার্য সম্পন্ন হইয়াছে তাহাতে দেশবাসী চমকিত হইয়াছে। দুর্ঘটনার অব্যবহিত পরেই স্বয়ং রেলমন্ত্রী অকুস্থলে ছুটিয়া গিয়াছেন। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করিয়া, স্থানীয় হাসপাতালে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আহত যাত্রীদের সমবেদনা জানাইয়াছেন। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ভারতীয় সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমানবাহিনী উদ্ধারকার্য ও চিকিৎসা প্রদানে সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছে। স্বয়ং রেলমন্ত্রী অকুস্থলে তিনদিন উপস্থিত থাকিয়া সমস্ত ব্যবস্থার তদারকি করিয়া মাত্র তিনদিন পর হইতে ট্রেন চলাচলের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহা সম্ভব হইয়াছে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব নিজে একজন কৃতবিদ্য প্রযুক্তিবিদ হইবার কারণে। এত অল্প সময়ের মধ্যে এত বড়ো একটি দুর্ঘটনাকে সামাল দিয়া পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক করিবার জন্য দেশবাসীর সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববাসীও আশ্চর্যচকিত হইয়া গিয়াছে। আমেরিকা প্রবাসী এক প্রবীণ প্রযুক্তিবিদের মতে এত কম সময়ে এত বড়ো একটি দুর্ঘটনা সামাল দিয়া সমগ্র পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক করা উন্নত দেশের পক্ষেও সম্ভব নহে। ইহা সম্ভব হইয়াছে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারতের নূতন যুগে প্রবেশ করিবার কারণেই।

আসলে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে নূতন ভারতের অভ্যুদয়কে রাজনৈতিক বিরোধীরা সহ্য করিতে পারিতেছেন না। এই নূতন ভারতে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরাও মানুষের সুখ-দুঃখের সহভাগী হইয়াছেন। শুধুমাত্র ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করিয়াই তাঁহারা নিজেদের দায়িত্ব সমাপ্ত করেন না। দুর্ঘটনা পীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সেবার হস্ত প্রসারিত করেন। এইজন্যই নরেন্দ্র মোদীকে তাহাদের বড়ো ভয়। তাই তাহারা মোদী সরকারের কোনো ভালো কাজের প্রশংসা করিতে পারেন না। তাহাদের নেতা বিদেশে যাইয়া দেশের শত্রুদের সম্মুখে দেশের নিন্দা করিয়া মনের জ্বালা প্রশমন করেন। ভারতবাসীর সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বিশ্ব যখন নূতন ভারতের আশা ও উন্মাদনা দেখিয়া ভারতের যোগ্য নেতৃত্বের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, তখন দেশের রাজনৈতিক বিরোধীরা ঘরে-বাহিরে দেশের নিন্দা করিয়া মনের জ্বালা মিটাইতেছেন। এই নূতন ভারতের প্রতি, নূতন ভারতের নেতৃত্বের প্রতি দেশবাসীর বিশ্বাস ও আশা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া বিরোধীরা ক্ষোভে ফুঁসিয়া উঠিয়া প্রলাপ বকিতেছেন। তাহারা শুধু বিরোধিতার জন্যই বিরোধিতা করিয়া চলিয়াছেন। করমণ্ডল ট্রেন দুর্ঘটনার পর রেলমন্ত্রীর কর্তব্যনিষ্ঠা ও কর্মদক্ষতাকে সম্মান না জানাইয়া তাঁহার পদত্যাগের দাবি বিরোধীদের রাজনৈতিক দেউলিয়াত্বকেই প্রকট করিয়াছে মাত্র।

সুভাষিতম্

সাক্ষরা বিপরীতাশ্চেদ্রাক্ষসা এব কেবলম্।

সরসো বিপরীতাশ্চেদ্ সরসত্বং ন মুঞ্চতি

সাক্ষর শব্দকে বিপরীত ক্রমে দেখলে রাক্ষস শব্দই পাওয়া যায়। সরস শব্দকে বিপরীত ক্রমে দেখলে তার সরসত্বের হানি ঘটে না।

‘গোরু আর অমাত্য’ সমানই হয়

মমতা চাইলেও ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হবে না

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

অমাত্যদের নিয়োগ নিয়ে বিনয়াধিকারিকের চতুর্থ প্রকরণে আচার্য চাণক্য বলেছেন, গোরু যেমন তার পরিচয়ের গণ্ডির বাইরে যেতে চায় না, তেমনি পূর্ব প্রতিষ্ঠিত ভৃত্য ছাড়া রাজা কাউকে অমাত্য নিয়োগ করেন না। আড়াই হাজার বছর আগে আচার্যদেবের কথা আজও দিনের আলোর মতো সত্য। আর এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে তা অতীব সত্য হয়ে উঠেছে প্রধানভাবে রাজ্যের বিরোধী দলগুলি আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটে যেভাবে রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহার দিকে আঙুল তুলেছে। সিনহাকে তারা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘সুপারি কিলার’ বলতে পিছপা হননি। অর্থাৎ ‘ভাড়াটে খুনি’।

রাজীবকে পশ্চিমবঙ্গের ভোট গণতন্ত্র খুন করতে মমতা নিয়োগ করেছেন। যদিও রাজীবের নিয়মতান্ত্রিক নিয়োগকর্তা রাজ্যপাল ড. সি ভি আনন্দ বোস। মমতার পাঠানো নামেই তাঁকে দস্তখত করতে হয়েছে। তবে চাইলে রাজ্যপাল রাজীবকে নিয়মতান্ত্রিকভাবেই বরখাস্ত করতে পারেন। মমতা বা রাজীব কেউই নিজের বিরুদ্ধে অভিযোগের বিরোধিতা করেননি। তাই বলা চলে যে দু’জনেই তাদের অভীষ্ট সাধন (এ ক্ষেত্রে গায়ের জোরে তৃণমূলের পঞ্চায়েত জয়) সুনিশ্চিত করতে কানে দিয়েছেন তুলো আর পিঠে বেঁধেছেন কুলো। যাকে বলে তারা স্বেচ্ছায় মেনে নিয়েছেন এ ব্যাপারে তারা নির্লজ্জ আর দু’কান কাটা।

বিরোধীরা যে অভিযোগই করুন না কেন। অমাত্য নিয়োগে চাণক্য বা ইতালীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানী নিকোলো ম্যাকিয়াভেলির ভবিষ্যদ্‌বাণী অব্যর্থ। দু’জনেই বলেছেন অমাত্য নিয়োগে রাজাকে সতর্ক হতে হয়। পদলেহী বা রাজানুগত অমাত্য না হলে রাজ্যের ক্ষতি। অমাত্য যেমন রাজার দুর্বলতা সম্পর্কে অবগত থাকবেন, রাজাও তেমনি অমাত্যের আসক্তি আর ক্লৈব্য সম্পর্কে হাতে প্রমাণ রাখবেন। আর মমতা ঠিক তাই করেছেন। তবে মমতা আর রাজীব সিনহার এই ভূমিকা নিয়ে আমার আলাদা মত। মনে হয় বিরোধীরা রাজনৈতিকভাবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিধন যজ্ঞে যেভাবে নিজেদের ব্রতী করেছেন তাতে মমতা আর রাজীব সিনহার যৌথ নিরাপত্তা ছাড়া তার কোনো উপায় নেই।

মমতার গোদের উপর বিষফোঁড়া তার দলের মধ্যে অভিষেক বিরোধী শক্তিশালী এক বৃদ্ধ গোষ্ঠী। তৃণমূলের শেষবেলায় বিরোধী চক্র ভাঙতে তাদের একজনকে সম্প্রতি সামনে নিয়ে আসা হয়েছে। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দলের মুখপাত্র করা হয়েছে। তৈরি হয়েছে আট সদস্যের নতুন কমিটি যাদের অধিকাংশ সদস্য একসময় অভিষেকের বিরুদ্ধে ছিল। মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম আর রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি তাদের উল্লেখযোগ্য। দলের মধ্যে অভিষেক ঝড়ে প্রায় বাতিল হয়ে যাওয়া বৃদ্ধ সৌগত রায়কেও দায়ে পড়ে কল্যাণবাবুর পাশে জায়গা দেওয়া হয়েছে।

২০১৩-র পুনরাবৃত্তি যেমন ২০১৮-তে হয়নি। গায়ের জোরে ভোট জিততে হয়েছিল। ঠিক তেমন ভাবে ২০১৮-র পুনরাবৃত্তি ২০২৩-এ হবে না। ধমকে চমকে রাজ্যের মানুষকে ভয় পাইয়ে ভোট ছিনতাই করা যাবে না।

তবে এ সব সাময়িক। পঞ্চায়েতের ফল বেরোনোর পর এরা আবার সবাই উবে যাবেন বলেই আমার ধারণা। অভিষেকবাবু যে বৃদ্ধচক্র বিরোধী তা আগেই প্রমাণিত হয়েছে। তাই আন্দাজ করে বক্সিবাবু আগেভাগেই সভাপতি পদ ছাড়তে চেয়ে অভিষেকের নাম প্রস্তাব করেছেন। অভিষেকবাবুর জনযাত্রাকে গায়ের জোরে আর কৌশলের জোরে সফল করে তুলতে মাঠে নেমেছেন মমতা আর রাজীব। সর্বোচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয়ে সব কিছু সামলে নেওয়ার এক অদ্ভুত খেলায় অনেকদিন থেকেই মেতেছেন মমতা। তাঁকে যাঁরা আইনি বুদ্ধি দেন তাঁদের বিচারবুদ্ধি নিয়ে আমার সন্দেহ রয়েছে। তাই আজ পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়েছেন মমতা। এ লেখা যখন ছাপা হবে তার আগেই পঞ্চায়েত ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে আটকাতে মমতা আর রাজীবের যৌথ প্রচেষ্টা হয়তো সুপ্রিম আদালতে আবার ধাক্কা খাবে।

মমতা আর তৃণমূল ২০১৩ সালের পঞ্চায়েত ভোটের উদাহরণ দিচ্ছে, কিন্তু ২০১৮-র কলঙ্কজনক ভোট জয়ের কথা বলছেন না। মমতা হেরে না গেলে বা রাজনৈতিক ধাক্কা না খেলে কিছুতেই নিজের ভুল স্বীকার করবেন না। এটাই তাঁর বড়ো দুর্বলতা। তাই মমতা মানতে চাইছেন না যে ২০১৩-র পুনরাবৃত্তি যেমন ২০১৮-তে হয়নি। গায়ের জোরে ভোট জিততে হয়েছিল। ঠিক তেমন ভাবে ২০১৮-র পুনরাবৃত্তি ২০২৩-এ হবে না। ধমকে চমকে রাজ্যের মানুষকে ভয় পাইয়ে ভোট ছিনতাই করা যাবে না। □

মরছে ওরা মরুক রাজনীতি থাক লাশনীতিতে

শাসকেষু দিদি,

রাজ্যে প্রসাসন বলে আদৌ কিছু অবশিষ্ট রয়েছে কি? হ্যাঁ দিদি, প্রশ্নটা আমারই। আপনার একান্ত অনুগত ভাই হয়েও বলছি, সত্যিই আছে কি? এই চিঠি আপনার হাতে কখন পৌঁছবে জানি না। কিন্তু এই চিঠি যখন লিখছি তখন পর্যন্ত রাজ্য সাতজনের মৃত্যু হয়ে গিয়েছে। হাসপাতালে অনেকেই রয়েছেন। ঘরছাড়ার সংখ্যা তো বললাম না। জানি সেটা ক্রমেই মৃত্যুর মতোই বাড়তে থাকবে। অনেক বাড়িতে আগুন লাগবে। আরও অনেককে নিজের ঘর-সংসার ফেলে আশ্রয় শিবিরে জায়গা নিতে হবে। কেউ কেউ হয়তো প্রাণ বাঁচাতে অন্য রাজ্যেও চলে যাবেন। না, দিদি আমি কল্পনা থেকে বলছি না। এ সব তো দেখেছি দিদি। বাম জমানাতেও দেখেছি। আপনার জমানাতেও তো দেখছি। এই চিঠি তাই সেই সব তৃণমূল কর্মীদের কথা ভেবে যাঁদের প্রাণও আপনি বাঁচাতে পারছেন না। যাঁরা আপনার জন্য প্রাণ সর্বস্ব দিচ্ছেন তাঁরা খুনও হচ্ছেন আপনার অনুপ্রেরণাপ্রাপ্ত লোকেদের হাতেই।

ধন্য দিদি। ধন্য আপনার 'এগিয়ে বাংলা' স্লোগান। দেশের অন্য কোথাও তো নয়ই, বিশ্বের আর কোথাও এমন হয় কি না জানা নেই। পঞ্চায়েত নির্বাচন মনোনয়নপত্র পেশ করা নিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে যে নিরবচ্ছিন্ন সন্ত্রাস চলেছে, প্রশাসন যন্ত্রটি সম্পূর্ণ বিকল না হলে তা কি ঘটতে পারত? পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে রক্তক্ষয়ী অশান্তি হবেই, তা সবার কাছেই এক প্রকার নিশ্চিত ছিল দিদি। কারণ, ২০১৮ সালে যা ঘটেছিল, তার পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা তো থাকবেই। বিশেষত, পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতের দখল রাখার সঙ্গে অর্থনৈতিক 'খাজনা' আদায়ের সম্পর্কটি এত ঘনিষ্ঠ এবং অবিচ্ছেদ্য যে, সেই নির্বাচনের গুরুত্বকে শুধু রাজনৈতিক মাপকাঠিতে মাপা যায় না। যত পঞ্চায়েত তত টাকা। তত প্রতিপত্তি। তত শক্তি। আগামী লোকসভায় গোলা, বারুদ কেনার জন্যও তো পঞ্চায়েত দখল দরকার। সেখান থেকেই আয় হবে।

তাই পঞ্চায়েত দখল রাখা বা কায়েম করার জন্য শাসকের হিংসা হবেই। প্রশাসনের সেই উদ্বেগ ছিল না? ছিল। কর্তারা জানতেন হবে। কিন্তু তাঁদের হাত-পা বাঁধা। কাকে ধরবেন? প্রশাসন যে তাঁদেরই পোষ্য। ২০১৮ সালের হিংসা দেখে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির কুশীলবদের মনে পরিবর্তন ঘটেছে প্রশাসন এমনটা ভেবে নেয়নি। আসলে, হিংসা ঘটলে তাতেও কিছু সুবিধা বা 'লাভ'-এর আশা আছে? নচেৎ, সন্ত্রাস দমনে এহেন ব্যর্থতার কারণ কী?

ভোটের অনেক আগে থেকেই রাজ্যের সর্বত্র প্রশাসন বলে আদৌ কিছু অবশিষ্ট রয়েছে কি? রাজ্যের সর্বত্র যে পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র বেরিয়ে আসছে, তা ভয়ংকর। শুধু লাঠিসোটা নয়, বোমা-বন্দুকের প্রাবল্য জানান দিচ্ছে যে, এই হিংসা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, আকস্মিকও নয়— এর পিছনে রীতিমতো প্রস্তুতি রয়েছে। পুলিশ-প্রশাসন কি ধরেই নিয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গ একটি মুক্তাঞ্চল, এখানে সংগঠিত রাজনৈতিক দুর্বৃত্তের হাতে বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস?

যারা মারছে আর যারা মরছে তাদের কোনও পরিচয় হয় না বলে এড়িয়ে যাবেন না। তাদের পদবিগুলো দেখুন। তাহলেই মালুম হয়ে যাবে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিকে লাশনীতি বানাচ্ছে কারা?

এটা তো ঠিক যে, নির্বাচনী হিংসায় পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার পিছনে রয়েছে আপনার তৃণমূল মানে শাসক দলের প্রতি আনুগত্য। কেননা, রাজনৈতিক হিংসার সিংহভাগই সংঘটিত হয় শাসক দলের বাহুবলীদের দ্বারা। কিন্তু ভাঙড়ের ঘটনা সেই অনুমানকেও প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিল। সম্প্রতি সেখানে যে তাণ্ডব হলো, তাতে মার খেয়েছেন মূলত তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকরা, মেরেছেন আইএসএফ-এর লোকজন। অস্ত্রের পরিমাণেও শাসক-বিরোধীর ফারাক করা মুশকিল ছিল— হয়তো বিরোধীদের দিকেই পাল্লা ঝুঁকে ছিল। সেক্ষেত্রেও পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা চোখে পড়ার মতো। তার থেকেই আশঙ্কা হয় যে, সেই নিষ্ক্রিয়তার যতখানি কারণ রাজনৈতিক আনুগত্য, হয়তো ততটাই নিছক অপদার্থতা। দিদি, যারা মারছে আর যারা মরছে তাদের কোনও পরিচয় হয় না বলে এড়িয়ে যাবেন না। তাদের পদবিগুলো দেখুন। তাহলেই মালুম হয়ে যাবে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিকে লাশনীতি বানাচ্ছে কারা? যাদের আপনি দুধেল গাই বলে থাকেন।

পশ্চিমবঙ্গের পুলিশবাহিনী হিংসা প্রতিরোধ করার এবং নিয়ন্ত্রণ করার দক্ষতা হারিয়েছে। সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্ট নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনী ব্যবহারের কথা বলেছে। কেউ প্রশ্ন করতেই পারেন যে, নির্বাচনের দিন ঘোষণার পরে যাবতীয় সিদ্ধান্তের এক্তিয়ার যেখানে নির্বাচন কমিশনের, সেখানে আদালতের পরামর্শই-বা দরকার হলো কেন? কিন্তু রাজ্য পুলিশ-প্রশাসনের উপর আস্থা বজায় রাখা যে উত্তরোত্তর কঠিন হচ্ছে, সে বিষয়ে ভাবনার অবকাশ নেই। স্বভাবতই সংকীর্ণ স্বার্থান্বেষী রাজনীতি খরতর হয়ে উঠছে। রাজ্যপাল যে ভাব ও ভাষায় হিংসা পরিস্থিতি বিষয়ে মন্তব্য করছেন, তাও অতিরিক্ত আশঙ্কার জন্ম দেয়। দিদি, এ অনাস্থা তো আসলে আপনার উপরেই। □

অতিথি কলম

সঞ্জয় বারু

ভূগোলভিত্তিক রাজনীতি ক্ষেত্রে তিন ধনুর্ধরের কার্যকলাপ

মোদীর মার্কিন রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় যত এগিয়ে আসছে চীনের আক্রমণাত্মক ভাবনাচিন্তা নিয়ে উভয়েই চিন্তামগ্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারত-আমেরিকা-চীন এই তিন দেশেরই একটি স্থিতিশীল বিশ্বের জন্য সম্মিলিত কথোপকথন বিশেষ প্রয়োজন।

এই সূত্রে প্রধানমন্ত্রীর মার্কিন সফরে বরাবরই একটা আড়ম্বর ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রদর্শন হয়। দুটি দেশেরই অভ্যন্তরীণ বাতাবরণ ও ঘরোয়া রাজনীতি বিভেদমূলক ও বিঘ্নিত বলে চিহ্নিত হলেও দুই নেতার মানসিক আদান-প্রদান বিশ্বের প্রধান দুটি প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে আশার সঞ্চার করে। এবারে কৌতূহল আরও বেড়েছে, কেননা কাকা স্যাম (মার্কিন রাষ্ট্রপতি) নাকি সকলের জন্য নতুন খেলনার আয়োজন করেছেন।

অনেকে বলছেন ভারতের প্রতি এবারে মার্কিনি নীতি কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখাবে। এই বিশেষ আচরণ (exceptionalism)-এর শুরু হয়েছিল মনমোহন সিংহের জমানায় ২০০৬ সালে পারমাণবিক চুক্তি সম্পাদনের সময় থেকে।

এটা নিশ্চিত আসন্ন সাক্ষাৎকারে চীনের দীর্ঘায়িত ছায়াপাত অবশ্যই থাকবে। এই সূত্রে বলি আজ থেকে এক দশক আগে চীন-ভারত- আমেরিকা এই ত্রয়ীর একটি সরকারি মত বিনিময় ক্ষেত্রে আমি চীনের বিশিষ্ট বৌদ্ধিক সমাহারদের (think tank) সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছিলাম। বিষয়টা কেবল চীনের বৌদ্ধিক ব্যক্তিদের মধ্যে নয় সেখানে ভারত ও মার্কিন অপর দুটি দেশের কূটনৈতিক চিন্তাবিদরাও ছিলেন। China Institute of Contemporary International Relations (CICIR), Centre for policy rescerch (India) ও Booking Institution (US) এই তিনটি উচ্চমার্গীয় প্রতিষ্ঠান থেকে চারজন করে প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছিল। এদের মূল বিষয় ছিল কী করে এই ত্রিদেশীয় আলোচনা নতুন চ্যালেঞ্জ ও সুযোগের সৃষ্টি করতে পারে।

একজন তরুণ চৈনিক পণ্ডিত একটি প্রশ্ন দিয়ে আলোচনাটির সূত্রপাত করেন। তিনি বলেন যে এটা তাঁর জানা যে যেহেতু চীন একটি দ্রুত অগ্রসরমান বৃহৎ অর্থনীতি তাই আমেরিকাকে চীনের সঙ্গে কথা বলতেই হবে। বিশেষ করে ইউএসএ একটি ক্ষয়িষ্ণু শক্তি (১৯১৩ সালে) সে কারণেই পরিস্থিতির পরিবর্তনের আশায় আলোচনা জরুরি। একই সঙ্গে অত্যন্ত অবাক হওয়ার ভান করে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন যে এখানে ভারত কী করছে? তাঁর অহংকার ভরা আবোল তাবোলকে নস্যাৎ করে আমরা আমাদের প্রত্যুত্তর দিয়েছিলাম। এই ত্রিপাক্ষিক সাক্ষাৎকার নেহাতই তাৎক্ষণিক ছিল না। দীর্ঘ এক বছর ধরে তিনটি দেশেই দীর্ঘ আলোচনায় একটা বিষয় উঠে আসে যে বহু বিষয়ে আমেরিকা ও চীনের ঐকমত্য হলেও ভারত সেখানে দ্বিমত পোষণ করেছে। আবার কিছু বিন্দুতে চীন ও ভারত একমত হলেও আমেরিকা রাজি ছিল না। আবার ভারত ও আমেরিকা একমত হলেও চীন গররাজি ছিল।

এখন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে 'Rising Asia' উত্থিত এশিয়া এই বিষয়টিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গেলে কেবলমাত্র চীন ও আমেরিকা যুদ্ধে যেন না জড়িয়ে পড়ে। একইসঙ্গে চীন ও ভারতকেও তাদের মধ্যে ভাসমান বহুবিধ সমস্যাকেও আপোশে সমাধান করে নিতে হবে। সেই কারণে দুটি এশীয় মহান শক্তিধর দেশের উত্থানকে ঠিক পথে চালিত করতে গেলে বিশেষ করে তাদের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারের প্রশ্ন যেখানে অগ্রাধিকার পাচ্ছে সেখানে দরকার প্রাজ্ঞতার; কোনো লোক দেখানো আড়ম্বর নয়।

এটা নিশ্চিত ওয়াশিংটনে মোদীকে ভারতের অর্থনৈতিক প্রতিশ্রুতি ও নতুন ক্রয়ের বরাতের জন্য ধরা হবে। একই সঙ্গে ভারতের থেকে শক্তিশালী চীনের বিরুদ্ধে সে কতটা মোকাবিলা-দক্ষ হয়ে উঠতে পারবে এটি নিয়ে মত বিনিময়ও বাদ যাবে না। একই সঙ্গে আমেরিকা গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনবে ভারত কীভাবে তার 'নিউ ইন্ডিয়া'র রূপরেখাটি তুলে ধরছে। এই সূত্রে কেবলমাত্র 'ভারতীয় বাজার'-এর আকর্ষণ আর চীনের আগ্রাসী নীতিই একামাত্র আলোচনা বিষয় হতে পারে না।

হ্যাঁ, গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত দ্বিপাক্ষিক অংশীদারি ক্ষেত্রে শক্তি বা বহুবলের বিষয়টি অত্যন্ত জরুরি। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্র ও প্রযুক্তি বিক্রয় এই দুটি বিষয় এর এক্তিয়ারভুক্ত। অবশ্যই এটি আদতে একটি ব্যবসায়িক সম্পর্ক। কী প্রযুক্তি বিক্রি করা হবে, কী চুক্তির ভিত্তিতে তা নির্ধারিত হবে এবং কী ধরনের উৎপাদন উভয় দেশের মধ্যে হবে সেটিই বিশেষভাবে আলোচ্য বস্তু। ভারত কী দিতে চায় তার বিনিময়ে কী পেতে পারে সেটিই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু।

তাহলে এই ধরনের বিক্রি ভিত্তিক সম্পর্কই কি নির্দেশ করবে যে ভারত আমেরিকার একটি সহমর্মী ও জোটের অন্তর্ভুক্ত দেশ? আমাদের উপজাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা শ্রী বিক্রম মিশরি এই বিষয়ে গত সপ্তাহে সিঙ্গাপুরের আইআইএসএস শাংগিরি লাল কথোপকথনে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ভারতের অবস্থান স্পষ্ট করে

বলেছেন 'ভারত কোনো অবস্থাতেই কোনো নির্দিষ্ট সামারিক জোটের সদস্য হওয়ায় বিশ্বাস করে না। কিন্তু আমরা বহু দেশেরই প্রতিরক্ষা ও সামরিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে তাদের অংশীদার হিসেবে কাজ করি'।

অবশ্যই নিকট ভবিষ্যতে ভারতকে আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করতে হবে কেননা আমাদের চীনের জিন পিং-এর আগ্রাসী নীতির সঙ্গে মোকাবিলার প্রস্তুতি নিয়ে রাখতেই হবে। এখানেই পারস্পরিক সম্পর্ক নির্মাণ একটু জটিল হয়ে পড়ে, কী কী পারস্পরিক নীতি বা দেওয়া নেওয়ার ওপর নির্ভর করে ভারত মার্কিন সম্পর্ক নির্মাণ করবে সেটি আবার ভারত চীনের সঙ্গে কেমন ধরনের সম্পর্ক গড়ে তুলছে তা আমেরিকা নজরে রেখে তবেই দৃঢ়ভাবে গড়ে তুলবে।

পূর্বে উল্লেখিত আমাদের সাক্ষাৎকারগুলিতে আমি সর্বদাই চীনের আলোচকদের বলেছি যে তারা সব সময়ই আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে উপকৃত হয়েছে বিশেষ করে ১৯৮০ থেকে ২০১০-এর মধ্যে। এবার ভারতেরও সেই ধরনের প্রচেষ্টা করতে অসুবিধে কোথায়? সকলেই জানেন যে চীন কখনই আমেরিকার সামরিক সঙ্গী ছিল না কিন্তু তাদের উভয়ের মধ্যে সামরিক ক্ষেত্র বিষয়ে যাকে বলে মিলিটারি সম্পর্ক খুবই মধুর ছিল। ভারতও সেই পদ্ধতিতে কোনো সরাসরি সামারিক চুক্তি সম্পাদন করবে না কিন্তু দেশের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে যা করার সবই করবে। ভারতের মূলগত বিদেশনীতির উন্নতি নির্ভর করে দেশের অর্থনীতির উন্নতির ওপর। কী ভিত্তিতে অর্থাৎ চুক্তি বা বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নতি হবে তা আজও প্রধান গুরুত্বের দাবিদার। এই সূত্রে খেয়াল রাখা দরকার, উন্নতির সঙ্গে ভারত একটি মজবুত প্রতিবেশী অঞ্চল অটুট রাখার ওপর গুরুত্ব দেয়।

এক্ষেত্রে চীনের সঙ্গে বৈরী সম্পর্ক তৈরি হলেও ভারত নাচার। তার আরও প্রতিবেশী রয়েছে। এই সূত্রে ইউরোপের নানান দেশ থেকে নানা ধরনের মহান বাণী ভেসে এলেও কী আমেরিকা, কী ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন উভয়েই চীনের সঙ্গে দৃঢ় সংকল্প চায়। সেই কারণে উন্নতির সোপান আরোহণের ক্ষেত্রে যদি চীনের কোনো স্খলন হয় তা হবে মূলত তাদের অভ্যন্তরীণ সমস্যার কারণে, কোনো বহির্দেশীয় প্রভাবের জন্য নয়। মনে পড়বে গোটা সোভিয়েতের পতন হয়েছিল নিজেদের সমস্যা নিজেদের সমাধানের ব্যর্থতায়, আমেরিকার হস্তক্ষেপে নয়।

আগামী এক দশকে চীনের অগ্রগতি যত ঢিলে হয়ে আসবে আর ভারত অগ্রগতির বাড়তি জ্বালানি পাবে সে সময় পৃথিবীর বৃহৎ তিন শক্তি— আমেরিকা, চীন ও ভারতকে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে আরও মসৃণভাবে আলোচনায় আনতে হবে, কেননা তখন আর দ্বিপাক্ষিক শক্তি নয়, বিশ্ব ত্রিপাক্ষিক শক্তি বলয়ে অবস্থান করবে। এই কারণেই একটি ত্রিপাক্ষিক আলোচনার সূত্রপাত জরুরি।

ভারতের অনেক ত্রিপাক্ষিক হতে পারে রাশিয়া-ভারত-চীন, জাপান-ভারত-আমেরিকা কয়েকটি উদাহরণ মাত্র। কিন্তু বর্তমানে সময় এসেছে সেই তরুণ বৌদ্ধিক কর্তার জবাব দেওয়ার, ভারত কেন? এখন ভারত জীবন্ত শক্তি।

(লেখক বিশিষ্ট রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক ও নীতি নির্ধারক)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে, গত জন্মাষ্টমী '২২ থেকে স্বস্তিকার ৭৫ বছর পালনের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেই অবসরে একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশের কাজও হাতে নেওয়া হয়েছে। সংরক্ষণযোগ্য এই গ্রন্থটি স্বস্তিকায় এযাবৎ প্রকাশিত বিশিষ্ট লেখকদের নির্বাচিত রচনার সংকলন। এটি আগামী অক্টোবর '২৩-এ প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা।

গ্রন্থটির মূল্য ধার্য করা হয়েছে ৪০০ টাকা।

প্রকাশ পূর্ব মূল্য ৩০০ টাকা (অর্থাৎ ১৫ আগস্ট, ২০২৩ -এর মধ্যে যাঁরা সম্পূর্ণ টাকা জমা দিয়ে কপি বুক করবেন তাদের জন্য)।

১৫ জুন, ২০২৩ থেকে অনলাইনে ওই টাকা পাঠানো যাবে। অনলাইনে টাকা পাঠালে নিচের দেওয়া ফোন নম্বরে অবশ্যই জানিয়ে দেবেন। জেলা অনুসারে তালিকা-সহ টাকা জমা করতে পারেন।

যোগাযোগ—

শ্রী তপন সাহা — ৯৯০৩০০২৯০১

শ্রী মহিম দাস — ৯৪৭৭৩৯৯২৯৭

অনলাইনে টাকা পাঠানোর Bank Details—

Name - Swastik Prakashan Trust
Bank - Punjab National Bank
Branch- Vivekanand Road, Kolkata-700006
A/c. No. - 0954000100121397
IFS Code - PUNB0095400

বিঃ দ্রঃ— নগদ টাকা স্বস্তিকা দপ্তরেই জমা দিতে হবে।
চেক দিলে Swastik Prakashan Trust—এই নামে চেক কাটতে হবে।

চীনকে রুখতে কোমর বাঁধছে ভারত-আমেরিকা

বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারের নবম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে ভারতের কূটনৈতিক সাফল্যের কথা শোনা গিয়েছে কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের মুখে। তাঁর বক্তব্য, প্রতবেশী দেশ থেকে সমগ্র এশিয়া মহাদেশ, আমেরিকা থেকে ইউরোপ--- গোটা বিশ্বই এখন ভারতের কথা শোনে। ভারত প্রকৃত অর্থেই সারা বিশ্বের কাছে কূটনৈতিক চালিকাশক্তিতে পরিণত হয়েছে। সেইসঙ্গে জয়শঙ্কর এও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, এই বিশাল কূটনৈতিক সাফল্য সত্ত্বেও চীনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের জটিলতা কাটানো এখনো সম্ভব হয়নি। এই প্রসঙ্গেই তিনি বিরোধীদের বিশেষ করে রাহুল গান্ধীর অভিযোগ 'বিনা যুদ্ধে নরেন্দ্র মোদীর আমলে চীন ভারতের হাজার বর্গকিলোমিটার জমি দখল করেছে', তা নস্যাৎ করে দেন। উলটে রাহুল গান্ধীকে তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, প্যাংগং লেকে এবং অরুণাচল সেক্টরে চীন ভারতের জমি দখল করেছে মোদীর আমলে নয়, বরং জওহরলাল নেহরুর প্রধানমন্ত্রিত্বের সময়।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংহের সঙ্গেমার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব লয়েড অস্টিন

তাঁর বক্তব্য, চীনা সেনারা ক্রমশ সীমান্তের দিকে এগিয়ে আসছে, ফলে ভারতীয় সেনারাও তাই করতে বাধ্য হচ্ছে। এই জায়গা থেকেই সংঘাত ও উত্তেজনা ছড়াচ্ছে। তিনি বলেছেন, রাহুল গান্ধীর চীনের ভারতের জমি দখল করার গল্পের পিছনে রাজনীতির হাত হয়েছে। তিনি এই বিভ্রান্তিমূলক প্রচার চালাচ্ছেন স্রেফ রাজনৈতিক খাতিরে, এমনটাই অভিমত কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রীর। অন্য একটি প্রসঙ্গে জয়শঙ্কর এও মন্তব্য করেন, রাহুল গান্ধীর স্বভাবই হচ্ছে বিদেশে গিয়ে ভারতের নিন্দা করা। সারা বিশ্বের সামনে এভাবেই ভারতকে নীচু করতে পারলে তাঁর অভিষ্ট সিদ্ধ হয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, বিদেশের বুকে দাঁড়িয়ে নিজের রাজনৈতিক স্বার্থে এভাবে দেশের সার্বভৌমত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলা, দেশপ্রেমের কোন অধ্যায়ে লেখা রয়েছে? বিশেষ করে, তাঁর বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় যেখানে দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তায় বিপদ দেখা দিতে পারে।

কিন্তু চীনকে ঠেকানোর কূটনৈতিক- সামরিক কৌশল ভারতের দিক দিয়ে বিন্দুমাত্র থেমে নেই। এই প্রতিবেদন যখন লেখা হচ্ছে, তখন ওয়াশিংটনের উদ্দেশে পাড়ি জমিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই প্রতিবেদন যখন প্রকাশিত হবে, দু'দেশের মধ্যে কূটনৈতিক আলোচনার নির্যাস, এমনকী কোনো সামরিক চুক্তি সম্পন্ন হলেও তার খবর সংবাদমাধ্যমে উঠে আসবে। কিন্তু সেই আলোচনার গতিপ্রকৃতি কোন দিকে মোড় নিচ্ছে, তার আভাস পাওয়া যাচ্ছে জুন মাসের গোড়ায় মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব লয়েড অস্টিনের ভারত-সফরে। সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, চীনকে আটকাতে ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও মজবুত করতে চায় আমেরিকা।

গত ৪ জুন এ ব্যাপারে কথাবার্তা বলতে ভারতে আসেন মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব লয়েড অস্টিন। জুনের ৫ তারিখ তিনি ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন। আলোচনায় চীনকে ঠেকাতে দাবি পাক্ষিক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও মজবুত করার বিষয়ে জোর দেওয়া হয়। কূটনৈতিক মহল মনে করছেন, চীনের অর্থনৈতিক উত্থানের গালগল্প সুপরিকল্পিত ভাবে বিশ্ববাজারে ছড়িয়ে যেভাবে চীন তার যুদ্ধপ্রবণতাকে উসকে দিচ্ছে তাতে আমেরিকা বিষম উদ্বিগ্ন। এই পরিস্থিতিতে ভারতের সহযোগিতা ছাড়া আমেরিকার সামনে দ্বিতীয় কোনো পথ খোলা নেই।

সরকারি সূত্রের খবর অনুযায়ী, বৈঠকে প্রতিরক্ষা বিষয় ছাড়াও ক্লিন এনার্জি, মহাকাশ ইত্যাদি প্রযুক্তি বিষয়েও দ্বিপাক্ষিক অংশগ্রহণ আরও বৃদ্ধি করার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। বৈঠকে আরও কথা হয়েছে, প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ভারতের বিদেশি প্রযুক্তি ব্যবহার নিয়ে। বিশেষ করে রাশিয়া থেকে অস্ত্র আমদানিতে ভারতের জোর দেওয়া নিয়েও আলোচনা হয়। বিদেশি নির্ভরতা কমিয়ে দেশীয় প্রযুক্তির গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর কথা উঠে এসেছে দু'দেশের এই শীর্ষ বৈঠকে।

সূত্রের খবর, মোদীর মার্কিন সফরে জেনারেল ইলেকট্রিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভারত যুদ্ধ বিমান তৈরির কথা ঘোষণা করতে পারে। ২০১২ সাল থেকে এই প্রযুক্তি হস্তান্তরের প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহ মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব লয়েড অস্টিন ৫ জুন দিল্লিতে দ্বিপাক্ষিক প্রতিরক্ষা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। সেখানে তারা জেনারেল ইলেকট্রিক প্রযুক্তি হস্তান্তর চুক্তি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেছে।

জেনারেল ইলেকট্রিক প্রযুক্তি ব্যবহার চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়গুলি চীনের আক্রমণাত্মক পদক্ষেপ ও পাকিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে আলোচনায় গুরুত্ব পেয়েছে বলে খবর। প্রতিরক্ষা দপ্তর সূত্রে আরও খবর, মূলত ভারত পাকিস্তান ও চীন সীমান্তে ব্যবহার করার জন্য আমেরিকার জেনারেল অটোমিক্স আরোনটিক্যাল সিস্টেমস ইনকর্পোরেশন (জিএ-এএসআই) থেকে ১৮টি ড্রোন কেনার পরিকল্পনা করেছে। এতে খরচ পড়বে প্রায় দেড় থেকে দুই বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে দু'দেশের পারস্পরিক সহযোগিতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পাওয়ায় ওই অঞ্চলে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দু'দেশের সহযোগিতায় ভারত মহাসাগর অঞ্চলেও চীনের দাপট কমে শান্তি আসবে বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের আশা। ▫

বদলাচ্ছে আমার দেশ, বদলাচ্ছে মানুষের মন

শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী

নিউজ ক্লিপিং নম্বর ওয়ান। ২ জুন, রাত্রি ৭টা। স্থান ওড়িশার বালাসোর। ট্রেন লাইনের ধারে দুমড়ে মুচড়ে উলটে পড়ে রয়েছে ১০/১৫টি বগি। চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যন্ত্রাংশ, থলে, ব্যাগ, কাপড় চোপড়, জিনিসপত্র। চারিদিকে মানুষের আর্তনাদ। অন্ধকারে কে জীবিত, কে মৃত ঠাহর করা কঠিন। তারই মধ্যে বছর আট দশেকের এক বালক হাউমাউ করে কেঁদে চলেছে। তখনও সরকারি উদ্ধারকারী দল এসে পৌঁছয়নি। হঠাৎ কোথা থেকে উদয় হলো নস্যি রঙের প্যান্ট আর সাদা জামা পরা একদল যুবক। মোবাইল আর টর্চের আলোয় শুরু হলো উদ্ধারকাজ। তাদেরই একজন এসে বালকটিকে জিজ্ঞাসা করলো তার সঙ্গে বড়ো কে আছে ? দুর্ঘটনার আকস্মিকতায় বালকটি তখন কথা বলার ক্ষমতাও হারিয়েছে। শুধু তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে একটানা কান্নার শব্দ, দু'চোখে জলের ধারা। বালকটিকে কোলে তুলে নিল যুবকটি, গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, ভয় পেয়ো না, আমরা আছি আমরা তোমার মা বাবাকে খুঁজে এনে দেব। —গত ২ জুন রাত্রি ৭টায় বালাসোরের ট্রেন দুর্ঘটনার খবর দেখাতে গিয়ে এক প্রখ্যাত হিন্দি নিউজ চ্যানেল সেদিন রাত্রে এমনই একটি সংবাদ পরিবেশন করেছিল। খবরের শিরোনাম ছিল - 'আপদা মে আরএসএস'।

নিউজ ক্লিপিং নম্বর টু। দিনাঙ্ক ৪ জুন। দেশের প্রথম শ্রেণীর এক সর্বভারতীয় হিন্দি দৈনিকের খবরের শিরোনাম ছিল 'দেবদূত বনে সংঘকে স্বয়ংসেবক'। ভেতরে বিস্তারিত খবরে ছিল সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের ওই ট্রেন দুর্ঘটনায় সেবাকাজের বিবরণ। কীভাবে পাঁচশোর বেশি স্বয়ংসেবক এনডিআরএফ ও জেলাপ্রশাসনের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ত্রাণ ও উদ্ধারকাজে লেগেছিল, তার বর্ণনা। ওই অন্ধকারে ভাঙাচোরা বগিতে ঢুকে যন্ত্রণায় কাতরানো আহত যাত্রীদের উদ্ধার করে, কাঁধে করে বাইক, টেম্পো, প্রাইভেট কারে চাপিয়ে নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কীভাবে পাঠিয়েছিল, কীভাবে হাসপাতালে লাইন দিয়ে স্বয়ংসেবকরা আহত যাত্রীদের বাঁচাতে কয়েকশো ইউনিট রক্তদান করেছিল, কীভাবে আটকে পড়া অবশিষ্ট যাত্রীদের খাদ্য-পানীয় পৌঁছে দিয়েছিল, তাদের থাকার ব্যবস্থা, ফোনের মাধ্যমে পরিবারের সাথে যোগাযোগ —এই সব কাজ সুচারু রূপে করেছিল, তার বিবরণ ছিল সেখানে। আর এ সবই করেছিল সঙ্ঘ ও তার সহযোগী সংগঠন— বিদ্যার্থী পরিষদ, হিন্দু জাগরণ মঞ্চ, বজরং দল, সেবা ভারতীর স্থানীয় কার্যকর্তারা।.

আইআইটি-র ইলেক্ট্রনিক অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশনের মেধাবী ছাত্র, বিদেশি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির উচ্চপদস্থ এক অফিসার সবকিছু ছেড়ে মোদীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ট্রেনলাইনে রাতের অন্ধকারে বসে রয়েছেন, দুর্ঘটনা পীড়িত মানুষের সেবা করছেন একজন সাধারণ মানুষ হিসেবেই। এই হলো আধুনিক ভারত, নতুন ভারত, পরিবর্তিত ভারত, সমর্থ ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত।

নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কোন ঘটনার কথা বলছি। ঠিক ধরেছেন, গত ২ জুন ওড়িশার বালাসোরে যে ভয়ানক ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছিল, সেই করমণ্ডল এক্সপ্রেসের সঙ্গে আর দুটো ট্রেনের সংঘর্ষের কারণে ২৮৮ জন যাত্রীর প্রাণহানি এবং ১২০০ জনেরও বেশি আহত হয়েছিলেন। আর সঙ্ঘ মানে কোন সংগঠনের কথা বলছি সেটা নিশ্চয় আর নতুন করে বলে দিতে হবে না। হ্যাঁ ঠিক ধরেছেন, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া, প্রিন্ট মিডিয়ার দৌলতে এদেশের সকলেই বুঝে গিয়েছেন সেই সঙ্ঘ হলো দেশের সর্ববৃহৎ স্বেচ্ছাসেবী সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ।

ট্রেন দুর্ঘটনা নতুন নয়। কখনো যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে, কখনো-বা রেল কর্মচারীদের গাফিলতিতে, আবার কখনো দেশের মধ্যে থাকা শত্রুদের অন্তর্ঘাতে এর ছেদ পড়েনি। এই ট্রেন দুর্ঘটনা শুধু ভারতেই হয় এমন নয়, বিশ্বের তাবড় উন্নত দেশে যেখানে সর্বোৎকৃষ্ট টেকনোলজি ব্যবহার হয়েছে সেখানেও এই দুর্ঘটনা কোনোভাবে বন্ধ করা যায়নি। একশো শতাংশ সুরক্ষা বলে জগতে কিছু হয় না। উন্নত প্রযুক্তি, দক্ষ কর্মীর মাধ্যমে আমরা শুধু একে কমিয়ে আনতে পারি, কিন্তু বন্ধ করতে পারি না। এটাই রূঢ় বাস্তব।

কিন্তু আমরা যেটা করতে পারি তা হলো বিপদগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে। সেবা শুশ্রূষা করে তাদের কষ্টের ভার কমাতে। যে কাজে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ আজও

দেশের অগ্রণী সংগঠন। যে সংগঠনের নামেই আছে সেবার অঙ্গীকার। মানব সেবার অঙ্গীকার নিয়ে ৯৮ বছর আগে যে সংগঠন সৃষ্টি হয়েছে আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি। দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগই হোক, প্লেন দুর্ঘটনা হোক অথবা ট্রেন দুর্ঘটনা--- স্বয়ংসেবকরা সর্বপ্রথম পীড়িত মানুষদের কাছে পৌঁছে যান। তাই সমগ্র বিশ্বে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের নামন্তর হলো– 'রেডি ফর সেল্ফলেস সার্ভিস'। এ কোনো আশ্চর্যের বিষয় নয়। কিন্তু যা দেখে আজ দেশের মানুষ আশ্চর্যচকিত হচ্ছে তা হলো এদেশের সরকারের সহমর্মিতা। এদেশের প্রধানমন্ত্রী, রেলমন্ত্রী এঁদের আচরণ। স্বাধীনতার পর এদেশে কয়েকশো ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটেছে। কয়েক হাজার মানুষের প্রাণও গেছে।। কিন্তু বালাসোরের দুর্ঘটনার পর রেলমন্ত্রী-প্রধানমন্ত্রীর যে ভূমিকা দেশ দেখেছে তা শুধু এদেশের মানুষের নয়, উন্নত দেশগুলিকেও মুগ্ধ করেছে। সে পরিষেবার দিক থেকে হোক কিংবা অতি অল্প সময়ের মধ্যে ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে, রেললাইন সংস্কার করে মাত্র তিনদিনের মধ্যে রেলকে তার স্বাভাবিক ছন্দে ফিরিয়ে আনা– সবক্ষেত্রেই রেলমন্ত্রক আজ দেশ বিদেশে প্রশংসার পাত্র হয়ে উঠেছে।

খুব বেশি অতীতে যাওয়ার দরকার নেই। বিগত পঁচিশ-ত্রিশ বছরের রেলমন্ত্রীদের কালখণ্ডের দিকে তাকালে, সে জাফর শরিফ থেকে নীতীশ কুমার, লালুপ্রসাদ, মমতা ব্যানার্জি, মল্লিকার্জুন খাঙ্গে প্রভৃতি ঝানু রাজনীতির কুশীলবরা-- কে বসেননি এই রেল মন্ত্রকের চেয়ারে? কার সময় ঘটেনি বড়ো দুর্ঘটনা? কার সময় মারা যায়নি শয়ে শয়ে মানুষ? মমতা ব্যানর্জির রেলমন্ত্রিত্বের কালে ২০১০ সালের ২৪ মে পশ্চিমবঙ্গের খেমাশুলি আর সরডিহা স্টেশনের মাঝে ঘটেছিল জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেসে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। মারা গিয়েছিল ১৫০ জন যাত্রী। মাওবাদী নেতা ছত্রধর মাহাত ছিলেন এই অন্তর্ঘাতের মূল চক্রী। তিনি অবশ্য মমতা ব্যানার্জির আশীর্বাদে জঙ্গল মহলে তাঁর দলের কর্মকর্তা। বর্তমানে অবশ্য আদালতের নির্দেশে জেলে। সেই দুর্ঘটনা তো আমাদের চোখের সামনে ঘটেছিল। কিন্তু সেদিন তো আমরা মমতা ব্যানার্জিকে দেখিনি বর্তমান রেলমন্ত্রীর মতো রাত জেগে দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া বগিতে বগিতে ঘুরে যাত্রী উদ্ধার করতে। সেদিন কি আমরা তঁকে দেখেছিলাম অশ্বিনী বৈষ্ণবের মতো নিহত-আহত যাত্রীদের দুঃখে কান্নায় চোখ ভেজাতে? ৪৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস গরমে অস্থির রেলের অফিসাররা যখন তাঁকে বলছেন– স্যার, আপনি এবার ফিরে যান, আমরা এদিকটা সামলে নেব। তখন আগে কোনো রেলমন্ত্রীর মুখে বলতে শুনেছি কি আপনাদের ছেড়ে কোথাও যাব না। যতক্ষণ না সব যাত্রীকে উদ্ধার করা হচ্ছে আমি এখানেই থাকবো। আমাকে নিয়ে চিন্তা করবেন না। — এমন মানবদরদি রেলমন্ত্রী অতীত ভারত দেখেছে কি? এই সেদিনের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গন্ধী, ভিপি সিংহ, নরসিমা রাও, মনমোহন সিংহের সময়েও দেশে কম ট্রেন দুর্ঘটনা হয়নি। এঁরা প্রত্যেকেই সেই সময় সেই দুঃখজনক ঘটনায় শোক ব্যক্ত করেছেন। তাঁদের সাধ্যমতো আর্থিক সহায়তাও করেছেন। কিন্তু দুঃখীজনের ব্যথায় নরেন্দ্র মোদীর মতো ঝরঝর করে শিশুর মতো কাঁদতে আমরা এর আগে কোনো প্রধানমন্ত্রীকে দেখেছি কি? এসব দেখে দেশবাসীর আজ মনে হচ্ছে এই প্রধানমন্ত্রী, এই রেলমন্ত্রী বাকিদের থেকে আলাদা। এই টিম আলাদা, যাকে অন্যের থেকে সহজে পৃথক করা যায়।

তবু এটাই দুঃখের যে, এদেশের বিরোধী শিবিরে থাকা রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীরা এই ঘটনার পরে বর্তমান রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের পদত্যাগ চাইছেন। তাদের ভাবটা এমন যে অশ্বিনী বৈষ্ণবের স্বল্প শিক্ষায়, অদক্ষতায়, রেলমন্ত্রী হওয়ার চরম অযোগ্যতায় এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। বরং তাঁর যারা পূর্বসূরী সেই মমতা ব্যনার্জি, লালুপ্রসাদ, নীতীশ কুমার, মল্লিকার্জুনরা রেলে টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিঙের মাস্টার্স করা এক-একজন বিজ্ঞজন নন।

কারোর সমালোচনা করার আগে নিজের সঙ্গে তার তুল্যমূল্য বিচার করা উচিত। বাস্তব তো এটাই যে এরা কেউই শিক্ষায় ও যোগ্যতায় অশ্বিনী বৈষ্ণবের হাঁটুর কাছাকাছি নন। চুরি করে পাশ করা ভুয়ো এলএলবি ডিগ্রিধারী, পশুখাদ্য চুরিতে জেলখাটা আসামি, রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে সার্টিফিকেট হাতানো রাজনীতির ফড়েরা আজ এসেছেন আদ্যোপান্ত উচ্চশিক্ষিত অরাজনৈতিক এক প্রাজ্ঞব্যক্তির শিক্ষা ও যোগ্যতা নিয়ে জ্ঞান দিতে? যিনি ১৯৯১ সালে ইলেক্ট্রনিক ও কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিঙের স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত ছাত্র, কানপুর আইআইটি থেকে এমটেক করা ইঞ্জিনিয়ার, ১৯৯৪-এ সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ২৭ র‍্যাঙ্ক করা আইএএস, ২০০৮ সালে ইউএসএ থেকে এমবিএ করা উচ্চশিক্ষিত রেলমন্ত্রীর শিক্ষাগত যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা নিয়ে রাজনীতির চোরছ্যাঁচোড়েরা যদি প্রশ্ন তোলেন তবে তাকে কী বলা উচিত?

এই লোকটিই দুদিন ধরে নাওয়া খাওয়া ভুলে প্রখর রোদে দুর্ঘটনার উদ্ধার কাজে তদারকি করছিলেন। এর আগে বহু রেল দুর্ঘটনা ঘটেছে। রেলমন্ত্রীরা দুর্ঘটনাস্থলে এসেছেন, গিয়েছেন। একরমভাবে কেউ বিপদগ্রস্ত যাত্রীদের পাশে থেকেছেন? উদ্ধারকারী দলের একজন হয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছেন? চাইলে ইনিও বাকিদের মতো হেলিকপ্টারে উড়ে দুর্ঘটনাস্থলে এসে আমলা-গামলা-কর্মচারীদের দু'চারটে আদেশ উপদেশ দিয়ে টিভি ক্যামেরার সামনে কয়েকটা বাইট দিয়ে, কিছু ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব আউড়ে, বিরোধীদের দোষারোপ করে, কয়েজন অফিসারকে সাসপেন্ড করে কেটে পড়তে পারতেন— যেমনটা ব্যানার্জি, কুমার, যাদব, খাঙ্গেবাবুরা এতকাল ধরে করে এসেছেন-- যেটা উনি করেননি। বরং একজন মানুষ হিসেবে, যাত্রীদের পরমাত্মীয় হিসেবে যা যা করা উচিত তাই করেছেন।

এরমধ্যে একটি অন্য চিত্রও আছে। দেশের বিরোধী দলগুলি যখন এই রেলমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে শাপশাপান্ত করছেন, অপদার্থতার জন্য চোখা চোখা বাক্যবাণে বিদ্ধ করছেন, দাবি করছেন পদত্যাগের-- তখন যে রাজ্যে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে সেই ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েকের আচরণও মনে রাখা উচিত। তিনি খবর পেয়ে ছুটে গিয়েছিলেন অকুস্থলে। নিজের প্রশাসনকে সম্পূর্ণভাবে লাগিয়ে দিয়েছিলেন উদ্ধার কাজে। সরাসরি কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে। সব রকমের সরকারি সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দিয়েছিলেন রেলমন্ত্রীকে। সেদির নবীনবাবু কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রীর কতর্বনিষ্ঠা, ত্যাগ, আনুগত্য, দেশপ্রেম, কাজের প্রতি আবেগ আর দুর্ঘটনা পীড়িত মানুষের প্রতি সমবেদনা দেখে শ্রদ্ধায় মাথা নত করেছিলেন।। দুহাত তুলে নমস্কার জানিয়েছিলেন ওড়িশা থেকে রাজ্যসভায় মনোনীত রেলমন্ত্রীকে। ওড়িশায় বিজেডি সরকার। সেরাজ্যে প্রধান বিরোধী দল বিজেপি। তাই আমরা আশা করেছিলাম নবীনবাবু হয়তো পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর মতো হেলিকপ্টারে উড়ে গিয়ে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের পদত্যাগ চাইবেন, বিজেপির ঘাড়ে দোষ চাপাবেন। কিন্তু না, তিনি তা তিনি করলেন না। বরং তিনি রেলমন্ত্রকের প্রশংসা করলেন। আর তস্য বোকা বিজেপি দল এত বড়ো দুর্ঘটনার দায় কোথায় বিরোধী দল বিজেডির ওপর চাপাবেন অথবা বিজেডি-মাওবাদী চক্রান্তের গল্প প্রচার করবে, ঠিক যেমন জ্ঞানেশ্বরী দুর্ঘটনার পর মমতা ব্যানর্জি রেলমন্ত্রী থাকার সময় করেছিলেন-- তা না বিজেপি-বিজেডি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে উদ্ধার কাজে লেগে পড়েছে। আমরা বঙ্গবাসী তো প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে বসু, ভট্টাচার্য, ব্যানার্জিদের কাছ থেকে এরকমই দেখে এসেছি। আমরা বঙ্গবাসী। আমরা তো রাজনীতিটা ভালোই বুঝি। আমরাই হলাম দেশের সবচেয়ে বুদ্ধিমান জাতি। শিক্ষিত, জ্ঞানী, সংস্কৃতিমনস্ক মানুষ। আমরা ওড়িশাবাসীদের মতো অত বোকা নই। আমরা জানি কীভাবে দুর্ঘটনা নিয়ে, মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি করতে হয়। আমরা জানি বন্যাও ম্যানমেড হয়, রেললাইনের ওভারহেড তারে বজ্রপাতের দায়ও রেলমন্ত্রীর হয়। আমরা জানি পোস্তার উড়ালপুল ভেঙে পড়ার দায়ও ৩৪ বছর শাসনকালের হয়। আর হাজার হাজার শিক্ষিত বেকারের চাকরি চুরির দায়ও বিজেপির হয়। আমরা জানি, সিএএ-র নামে মালদা-মুর্শিদাবাদ-উলুবেড়িয়ায় নিরীহ দেশভক্ত দুধেল গাইদের ট্রেন পোড়াবার সময় দুচোখ বন্ধ রাখতে হয়। আর বালাসোরের দুর্ঘটনার পর রেলদপ্তরের অপদার্থতার জন্য দুচোখ ঝেঁপে কাঁদতে হয়। আমরা জানি, অর্থনৈতিকভাবে প্রায় দেউলিয়া এই পশ্চিমবঙ্গকে ইউপি, গুজরাট না হতে দেওয়ার স্লোগানে ভরিয়ে তুলতে হয়, পরক্ষণেই কাজের খোঁজে ঘরের ছেলেকে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে সেই গুজরাট, ইউপি-র ট্রেনে চাপিয়ে দিতে হয়। আমরাই আসলে রাজনীতিটা ভালো বুঝি।

কিন্তু না, এই নবীনবাবুরা, অশ্বিনী বৈষ্ণবরা ঠিক রাজনীতিবিদ নন। বোকা জনপ্রতিনিধি। যাঁরা প্রকৃতপক্ষে রাজনীতি করার জন্য নয়, জনসেবার ব্রত নিয়েছেন। তাই আগামী ২০২৪ সালে নিজের রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন দেখেও বিরোধী বিজেপি-র রেলমন্ত্রীকে সমালোচনা করার পরিবর্তে সুবর্ণসুযোগ হেলায় হারালেন নবীন পট্টনায়েক। একে অপরকে ভালো কাজের শংসাপত্র বিলি করলেন। পশ্চিমবঙ্গে নেতা-নেত্রীদের কাছ থেকে কিছুই শিখতে পারলেন না তাঁরা। চিন্তা করবেন না স্যার, দেশবাসী এতদিন এই ব্যানার্জি, যাদব, কুমার, খাঙ্গোদের মতো রেলমন্ত্রীতে অভ্যস্ত ছিল তো। তাই আপনাদের যোগ্যতা ও কাজের ধরনকে মানিয়ে নিতে আর একটু সময় লাগবে। আপনারা বরং নিজগুণে আমাদের মতো নির্বোধদের ক্ষমা করে দিন স্যার!

তবে আজ দেশ বদলেছে। দেশের মানুষের চিন্তাভাবনা বদলেছে। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে পরিচালিত সরকারের কার্যপদ্ধতি বিপ্লব ঘটিয়েছে। হৃদয় ছুঁয়েছে শহুরে উচ্চশিক্ষিত সমাজ থেকে শুরু করে দূর গাঁয়ে দিনমজুরি করা অতি সাধারণ মানুষটিরও। দৃষ্টিভঙ্গি বদলেছে বিশ্বজগতেরও। আধুনিক বিশ্বও আজ ভারতকে বিশ্বগুরুর মর্যাদা দিতে শুরু করেছে। তাই তো আইআইটি-র ইলেক্ট্রনিক অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশনের মেধাবী ছাত্র, বিদেশি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির উচ্চপদস্থ এক অফিসার সবকিছু ছেড়ে মোদীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ট্রেনলাইনে রাতের অন্ধকারে বসে রয়েছেন, দুর্ঘটনা পীড়িত মানুষের সেবা করছেন একজন সাধারণ মানুষ হিসেবেই। এই হলো আধুনিক ভারত, নতুন ভারত, পরিবর্তিত ভারত, সমর্থ ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত। যে ভারতের কর্ণধার একজন স্বয়ংসেবক নরেন্দ্র মোদী। ◻

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম-ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

কংগ্রেস শাসনে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা হরণ

'সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা'র অর্থ : ভারতীয় সংবিধানের ১৯ (১) (ক) ধারায় সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার কোনো স্পষ্ট উল্লেখ নেই। গণপরিষদের বিতর্কসভায় সংবিধানের খসড়া কমিটির চেয়ারম্যান ড. বাবাসাহেব আম্বেদকরের বক্তব্য অনুযায়ী মতামত প্রকাশের অধিকারের ক্ষেত্রে সংবাদমাধ্যম, একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি বা একজন নাগরিক যেহেতু সমান, সেহেতু সংবিধানে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার এই বিশেষ উল্লেখ অপ্রয়োজনীয়। ভারত সরকার বনাম অ্যাসোসিয়েশন যার ডেমোক্রেটিক রিফর্মসের মামলায় মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বলা হয়েছে যে বাক্‌স্বাধীনতা ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে তথ্য প্রদান ও গ্রহণ দুই-ই গুরুত্বপূর্ণ আঙ্গিক। যেহেতু তা মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাকে সূচিত করে। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস সংবাদপত্র বনাম ভারত সরকারের মামলায় সুপ্রিম কোর্টের বক্তব্য হলো, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংবাদমাধ্যম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণকারী সব আইন ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ সময়মতো বাতিল ঘোষণা করে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা বজায় রেখে দেশের আদালতসমূহ তার দায়িত্ব পালন করে। রমেশ থাপার বনাম মাদ্রাজ সরকার মামলার রায়ে বাক ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার সংজ্ঞার মধ্যে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতাকেও সংযুক্ত করেছে সুপ্রিম কোর্ট। এলআইসি বনাম মনুভাই শা মামলায় ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস বনাম ভারতসরকার মামলার রায় পুনর্ব্যাখ্যা করে সুপ্রিম কোর্ট জানায় যে মুখনিঃসৃত শব্দ বা বাক্য বা কোনো লেখন বা অডিয়ো-ভিসুয়াল মাধ্যমে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষিত হয়। এইসব মাধ্যম দিয়ে মত প্রচারের অধিকার প্রচারের ব্যাপ্তির পরিসীমাকেও নির্ধারণ করে। তাই সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিঃসন্দেহে একটি সংবিধান-স্বীকৃত মৌলিক অধিকার।

জওহরলাল নেহরু : ১৯৫১ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহরু সংবিধানের ১৯ (২) ধারায় প্রথম সংবিধান সংশোধনীর বলে বাক্-স্বাধীনতার ক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত সীমাবদ্ধতা (reasonable restriction) -কে যুক্ত করেন, যেখানে ভারতবর্ষের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব, দেশের নিরাপত্তা, বৈদেশিক সম্পর্ক, আইন-শৃঙ্খলা, শালীনতা-নৈতিকতা, আদালত অবমাননা, অপরাধমূলক কাজকর্মে উসকানির বিষয় সমূহ উল্লেখিত হয়। প্রেস (অবজেকশনেবল ম্যাটার) অ্যাক্ট, ১৯৫১-র এই কালা আইনের আড়ালে নেহরু সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা হরণের এই কুকর্মটি সারেন। কবি ও গীতিকার মজরুহ্ সুলতানপুরি নেহরুর কাজকর্মের সমালোচনায় একটি কবিতা রচনা করলে গ্রেপ্তার হন। এই ঘটনায় মত প্রকাশের স্বাধীনতার অভাব আরও প্রকট হয়। ১৯৫১ সালেই 'অর্গানাইজার' (রাষ্ট্রবাদী ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা)-র বিরুদ্ধে ইস্ট পঞ্জাব পাবলিক সেফটি অ্যাক্ট প্রয়োগ করে দেশভাগ, পাকিস্তান ইত্যাদি কোনো সাম্প্রদায়িক উসকানিমূলক বিষয়ে প্রকাশিতব্য সমস্ত খবর, প্রবন্ধ, বিশ্লেষণমূলক লেখা, ছবি ও কার্টুন পত্রিকা প্রকাশের আগে সরকারি যাচাইয়ের জন্য জমা দেওয়ার নির্দেশ জারি করেন দিল্লির চিফ কমিশনার। সরকারি অফিসার এডি গোরওয়ালা 'বিবেক' ছদ্মনামে টাইমস্ অব ইন্ডিয়া কাগজে একটি নিয়মিত কলাম লিখতেন। সেখানে নেহরুর ভূমিকার সমালোচনার জন্য সেই কলাম প্রকাশ নেহরু বন্ধ করে দেন। অর্গানাইজার ছাড়াও 'ক্রসরোডস্' পত্রিকাটি নেহরু পরিচালিত কংগ্রেস সরকার নিষিদ্ধ

ঘোষণা করে। সুপ্রিমকোর্ট এই নিষেধাজ্ঞাকে খারিজ করলেও প্রথম সংবিধান সংশোধনী এনে নেহরু সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে উলটে দেন।

ইন্দিরা গান্ধী : স্তালিন পরবর্তী রাশিয়ায় পৃথিবীতে বাক্ ও সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর সবচেয়ে বড়ো আঘাত আসে ভারতে, ইন্দিরা গান্ধীর সময়ে। তিনি জরুরি অবস্থা জারি করলে অসংখ্য সাংবাদিককে কারারুদ্ধ করা হয়। সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনামূলক লেখালেখির দায়ে বহু মানুষ জেলবন্দি হন এবং স্বাধীন সংবাদমাধ্যম পড়ে এক চরম সংকটের মুখে। ইন্দিরা গান্ধীর আমলে এইভাবে বাক-স্বাধীনতা হরণের ঘটনা আগে কখনো ঘটেনি। সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার নিরিখে গ্লোবাল ইনডেক্সে/বিশ্বসূচকে ভারতের স্থান হয় নিম্নগামী। সর্বত্র সেন্সরশিপ ছিল। সরকারি নীতি ও সংবাদপত্রে প্রকাশিতব্য সব রকমের খবরই ছাপার আগে সম্মুখীন হতো সরকারি যাচাইয়ের। ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন, মধ্যরাতে তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ অভ্যন্তরীণ অশান্তির কারণে জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে এই যুক্তিতে ভারতে 'জাতীয় জরুরি অবস্থা' সম্পর্কিত আদেশ জারি করেন। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সবরকমের নাগরিক স্বাধীনতাকে স্থগিত করে দেন। সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতাকে খর্ব করা হয়। ৪২তম সংশোধনী এনে সংবিধানকে করা হয় পরিবর্তিত। ইন্দিরা গান্ধী সরকারের এই স্বৈরতান্ত্রিক শাসনে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির বিরোধী দলনেতাদের, বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মীসমর্থকদের সাংবাদিক ও সমজকর্মীদের কারাবন্দি করা ছাড়াও, সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার নির্বিচারে হরণ করা হয়। সংবাদপত্রের ছাপাখানাগুলিতে রেইড করা হয় এবং জরুরি অবস্থা ঘোষণার পরবর্তী দিন গোটা দেশ থেকে যাবতীয় সংবাদপত্র উধাও হয়ে যায়। ২৬ জুন প্রকাশিত একমাত্র সংবাদপত্র হলো— 'মাদারল্যান্ড', যেখানে জরুরি অবস্থা জারির খবর প্রকাশের সঙ্গে এই ব্যাপক গ্রেপ্তারি ও জাতীয় স্তরে জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলনের খবর প্রকাশিত হয়। নয়া দিল্লির ঝাণ্ডেওয়ালায় রানি ঝাঁসি রোডের 'মাদারল্যান্ড' পত্রিকার অফিসের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হলেও পাশের কমিউনিস্ট মুখপত্র 'জনযুগের' অফিসে বিদ্যুৎ সংযোগ অবিচ্ছিন্ন থাকে।

সংবাদমাধ্যমের প্রতি নির্দেশ : ২১ মাস দীর্ঘ এই জরুরি অবস্থা চলাকালীন যখন দেশীয় সংবাদমাধ্যম আক্রান্ত তখন সরকার কর্তৃক সংবিধান প্রদত্ত অধিকার হরণের বিষয়টি সামনে আনার বিষয়ে বিদেশি সংবাদমাধ্যমগুলি হয়ে ওঠে তৎপর। কোনো গুজবে কান না দেওয়ার জন্য ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতি ছিল কড়া সরকারি নির্দেশ। মুখ্য প্রেস উপদেষ্টা (Chief Press Advisor) নামক একটি পদ সৃষ্টি করা হয়। এবং এই উপদেষ্টার অনুমতি সাপেক্ষে সব সংবাদ প্রকাশ বাধ্যতামূলক করা হয়। জরুরি অবস্থার সময়ে 'দ্য প্রিভেনশন অব পাবলিকেশন অব অবজেকশনেবল ম্যাটার' আইন পাশ করানোর মাধ্যমে সেন্সরশিপকে দেশের সাধারণ আইনে পরিণত করা হয় এবং একটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে 'প্রেস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া' অবলুপ্ত হয়।

গ্রেপ্তারি ও ভীতি প্রদর্শন : অধিকাংশ মূলধারার সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকা সরকারি রোষের মুখে পড়ে। কিছু পত্রিকাকে বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। অন্যান্য সাংবাদিকদের কারাবন্দি করা হয়। 'দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস' ও 'দ্য স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকার সংস্করণে জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়। জরুরি অবস্থার প্রতিবাদস্বরূপ এই দুই পত্রিকা 'সম্পাদকীয়' প্রতিবেনের পৃষ্ঠা ফাঁকা রাখে, অন্যান্য পত্রিকাও তাদের অনুসরণ করে। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী— দ্য টাইমস্ অব লন্ডন, দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট, দ্য লস এঞ্জেলস্ টাইমস্-এর সাংবাদিকদের বহিষ্কার করা হয়। ভীতি প্রদর্শনের ফলে দ্য গার্ডিয়ান ও দ্য ইকোনমিস্টের প্রতিনিধিরা ইংল্যান্ডে চলে যেতে বাধ্য হন।

বিবিসি প্রধান মার্কটুলিকেও বিবিসি ভারত থেকে প্রত্যাহার করে নেয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৭৬-এর মে মাসে প্রায় ৭০০০ সাংবাদিক ও সংবাদকর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিশ্ব জুড়ে ফ্রিডম হাউসের করা সমীক্ষা অনুযায়ী সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার নিরিখে ৭০-এর দশকের গোড়ার দিকে ভারতের স্থান ছিল তিন নম্বরে, যা ১৯৭৫ থেকে ৭৭-এর মধ্যে ৩৪ নম্বরে নেমে যায়। ২৮ ডিসেম্বর, ১৯৭৫-এ দ্য নিউইয়র্ক টাইমসের রিপোর্টে প্রকাশ, সংবাদমাধ্যমের এই স্বাধীনতা হরণ, ভারতের গণতান্ত্রিক সমাজের ওপর এক প্রবল আঘাত। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ প্রভাবিত সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকাগুলি জরুরি অবস্থার প্রতিবাদে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। এই কারণে পাঞ্চজন্য, অর্গানাইজার, মাদারল্যান্ড, তরুণ ভারত, বিবেক, বিক্রম, রাষ্ট্রধর্ম, স্বস্তিকা, যুগধর্মের মতো পত্রিকাগুলি রাজরোষের মুখে পড়ে। অর্গানাইজার ও মাদারল্যান্ড পত্রিকার সম্পাদক কেআর মালকানি হলেন প্রথম সাংবাদিক যাকে জরুরি অবস্থা জারির পর গ্রেপ্তার করা হয় এবং জরুরি অবস্থা শেষ হওয়া অবধি তিনি কারারুদ্ধ থাকেন। ইন্দিরা গান্ধীর সরকার এই ভীতি প্রদর্শনের অঙ্গ হিসেবে সরকারি সম্পত্তি থেকে সংবাদমাধ্যমগুলিকে উচ্ছেদ করতে শুরু করে। এর ফলে বহু সংবাদমাধ্যম বন্ধ হয়ে যায়। তদানীন্তন কেন্দ্রীয় সরকার 'মনোপলি অ্যান্ড রেস্ট্রিকটিভ ট্রেড প্র্যাকটিসেস (এমআরটিপি) অ্যাক্ট' প্রণয়ন করে দেশজুড়ে তথ্যের প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং সংবাদপত্র মুদ্রণে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে পাঠকদের সঙ্গে সংবাদমাধ্যমের যোগসূত্রকে ছিন্ন করে।

জরুরি অবস্থাকালীন আরও কিছু ঘটনা : ১৯৭৬-এর ২৯ জুন একটি সরকারি সমন্বয় বৈঠকে বন্ধুত্বপূর্ণ, নিরপেক্ষ ও বিরোধী— এই তিন প্রকার শ্রেণীবিন্যাসে সব সংবাদপত্রের একটি তালিকা প্রকাশ করতে মুখ্য তথ্য আধিকারিককে নির্দেশ দেওয়া হয়। একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দল (কংগ্রেস) সম্পর্কে সংবাদপত্রগুলির দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে উক্ত শ্রেণীবিন্যাসের সিদ্ধান্ত হয়। বিজ্ঞাপন লাভের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনা ও পৃষ্ঠপোষকতা হয়ে ওঠে অন্যতম শর্ত। সংসদে সরকার কর্তৃক প্রণীত নীতির বিপ্রতীপে সরকারি বিজ্ঞাপন বিতরণের ক্ষেত্রেও রাজনৈতিক বদান্যতা হয়ে ওঠে শেষ কথা। গৃহীত নীতির সম্পূর্ণ উলটো রাস্তায় হেঁটে প্রশাসন তার এই বিজ্ঞাপন নীতিকে কিছু সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে আর্থিক সাহায্য প্রদান এবং বাকিদের এই আর্থিক আনুকূল্য থেকে বঞ্চনার মাধ্যম করে তোলে। একাধিক সাংবাদিকের সরকারি স্বীকৃতি বাতিল করা হয় এবং একাধিক স্বীকৃতি সরকারি পর্যালোচনার মুখে পড়ে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশে ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো অসংখ্য সাংবাদিকের মনস্তাত্ত্বিক গঠন ও তাদের পূর্ববর্তী লেখনকে বিচার্য করে তাদের স্বীকৃতি পর্যালোচনার কাজটি নিয়ন্ত্রণ করে।

সরকারি প্রচারযন্ত্রসমূহের ক্রিয়াকলাপ : জরুরি অবস্থার সময়ে সরকারি সম্প্রচার ইউনিট সমূহের দুই ধরনের কার্যকারিতা চোখে পড়ে। এই সময়ে তারা সরকারি আনুকূল্য লাভ করে এবং কেন্দ্রীয় শাসকদল ও

তাদের নেতা-নেত্রীদের ভাবমূর্তি গড়ার কাজে ব্যবহৃত হয়। কংগ্রেসের তরফে প্রকাশিত একাধিক সুভেনিরে বিজ্ঞাপন দেওয়ার কাজে ডিএভিপি বা ডিরেক্টরেট অব অ্যাডভার্টাইজিং অ্যান্ড ভিসুয়াল পাবলিসিটিকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের ফিল্ম ডিভিশনের প্রযোজনায় একাধিক সিনেমা তৈরি করে সঞ্জয় গান্ধীকে মহিমান্বিত করা হয় এবং যুব নেতা ছাড়াও একজন স্বকীয় চরিত্রের নেতৃত্ব রূপে সেখানে তাকে তুলে ধরা হয়। পাবলিকেশন ডিভিশনকে ইন্দিরা গান্ধীর লেখা বইয়ের বিক্রি বাড়ানো, বিভিন্ন পত্রিকারও সাময়িকীতে শ্রীমতী গান্ধী সম্পর্কিত তথ্যপূর্ণ ও আকর্ষণীয় ছবি, প্রচ্ছদ প্রকাশ-সংক্রান্ত নির্দেশ দেওয়া হয়।

ইন্দিরা গান্ধী জমানায় জরুরি অবস্থা ব্যতীত আরও কিছু ঘটনা : ১৯৮০ সালে 'সিংভূম একতা ও সমতা' পত্রিকার সম্পাদক অজয় মিত্র ও গুরুশরণ সিংহকে কংগ্রেস সরকার গ্রেপ্তার করে। বিহারের কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী তাঁর এবং তার পরিবারের কুকর্ম প্রকাশের জন্য 'সানডে' পত্রিকার কপি পুড়িয়ে দেন। জরুরি অবস্থা জারির আগে ইন্দিরা জমানায় বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদকরা সরকারি কোপে পড়েন। সরকার বিরোধী লেখালেখির জন্য পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সমর্থকরা ৩০০০ কপি দর্পণ, বাংলাদেশ ও সত্যযুগী পত্রিকা পুড়িয়ে দেয়। ১৯৭২ সালে রেঁনেসা, জনতার মুখ ও ফ্রন্টিয়ার পত্রিকার সম্পাদকদের পত্রিকা বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। না করলে জোরপূর্বক বন্ধ করে দেওয়া হবে বলে হুমকিও দেওয়া হয়। সঞ্জয় গান্ধী ও তার সাধের প্রকল্প মারুতি নিয়ে সমালোচনামূলক লেখালেখির দায়ে হিন্দুস্থান টাইমসের সম্পাদক বিজি ভার্গিস বহিষ্কৃত হন।

রাজীব গান্ধীর আমল : ১৯৮৮ সালের জুলাই মাসে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী 'মানহানি বিল' নামক এক কালাকানুন নিয়ে আসেন। এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল সরকারকে অভিযুক্ত করে লেখালেখি ও এহেন কুরুচিকর লেখার সার্বিক দমন। প্রধানমন্ত্রী সমেত কংগ্রেসের একাধিক নেতার সঙ্গে জড়িত বোফর্স কেলেঙ্কারির বিষয়ে দ্য হিন্দু ও ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস পত্রিকায় বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী এই পদক্ষেপ নেন। ১৯৮৮-র ৪ সেপ্টেম্বর এক প্রেস বিবৃতিতে রাজীব গান্ধী ওই বিলটি সংবাদমাধ্যমকে পড়ে দেখতে বলেন। এই বিলের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করে তার সরকার সঠিক পথেই চলছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। ঐক্যবদ্ধ দেশীয় মিডিয়া এবং প্রবল জনরোষের প্রভাবে রাজীব গান্ধী মরিয়া হয়ে সংবাদমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন। দেশের বিভিন্ন শহরে, গ্রামে জনসভা করে স্বনামধন্য সাংবাদিকরা এই প্রস্তাবিত বিলের বিপজ্জনক দিকগুলি জনসমক্ষে তুলে ধরেন। চরম দুর্নীতিতে নিমজ্জিত সরকারের তরফে এই বিলের প্রস্তাবনা এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব সাংবাদিকদের অবস্থানের সত্যতাকেই দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠা করে। সাংবাদিক প্রভু চাওলার প্রতিবেদন অনুযায়ী ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের তরফে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে সবচেয়ে প্রবীণ সাংবাদিক মন্ত্রীকে এই বিল সম্পর্কে মতামত জানতে চেয়ে প্রশ্ন করতেন। এই প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে মন্ত্রীকে বিব্রত করে সমস্ত মিডিয়া কৌশলগতভাবে একসঙ্গে সম্মেলন কক্ষ ত্যাগ করেন।

ঐক্যবদ্ধ মিডিয়া ছাড়াও আইনজীবী সংগঠন, ছাত্রসংগঠন, ট্রেডইউনিয়ন ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের রাস্তায় নেমে আন্দোলনের ফলে সরকার পিছু হটে। কংগ্রেসের জাতীয় স্তরের প্রবীণ নেতৃত্বও এই বিলের বিরোধিতায় সরব হন। কয়েকজন কংগ্রেসি এমপি এই বিল প্রত্যাহারের দাবিতে সই সংগ্রহ করে প্রধানমন্ত্রীকে একটি স্মারকলিপি দিতে উদ্যোগী হন। এছাড়াও আসন্ন নির্বাচনের প্রবল চাপে রাজীব গান্ধী শেষপর্যন্ত রণে ভঙ্গ দেন এবং সে যাত্রায় সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষা পায়।

মনমোহন সিংহ : প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের জমানায় ২০০৯ সালে আইটি অ্যাক্টের মধ্যে ৬৬৩ ধারাটি সংযুক্ত করা হয় যা ছিল সংবিধানের ১৪, ১৯ ও ২১ নং অনুচ্ছেদের বিরোধী। আইনত যুক্তিহীন ও স্পষ্ট এই ধারাটি পুলিশকে ওই আইনের ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা প্রদানের ফলে এই আইটি অ্যাক্টের ৬৬-এ ধারা হয়ে ওঠে সরকারি অপব্যবহারের অস্ত্র। প্রসার ভারতীর সিইও জহর সরকার প্রসার ভারতীর বোর্ডকে লেখা একটি চিঠিতে জানান যে সরকারি প্রচারমাধ্যম দূরদর্শনের নির্ভরযোগ্যতার ওপর ক্রমশই বিস্তৃত হচ্ছে সরকারের ছায়া। সরকারি প্রচারমাধ্যমের আরও স্বাধীনতার দাবিকে কংগ্রেস সরকার উপেক্ষা করছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন। ২০১২ সালে শার্লিহেবদেতে প্রকাশিত কার্টুন ও একটি জেহাদ-বিরোধী সিনেমার প্রদর্শন বন্ধ করে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকার এই নতুন সহস্রাব্দেও মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণের প্রয়াস চালিয়ে গেছে।

কংগ্রেস শাসিত রাজ্যসমূহের পরিস্থিতি :

বিহার প্রেসবিল : ১৯৮২ সালে বিহারের কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী জগন্নাথ মিশ্র বিহার প্রেসবিল নিয়ে আসেন। এই বিল বিক্ষিপ্ত ঘটনার ওপর খবর, কুরুচির তথ্য এবং কাউকে ব্ল্যাকমেল করার উদ্দেশ্যে খবর প্রকাশ নিয়ন্ত্রণ করতে সরকারকে ক্ষমতা প্রদান করে। ওই আইনভঙ্গকারী সাংবাদিকদের ২ বছরের কারাবাসের সংস্থানও রাখা হয় ওই আইনে।

পশ্চিমবঙ্গ : ১৯৭৫ সালে ইন্দিরা গান্ধী জরুরি অবস্থা জারির আগে কংগ্রেস নেতা ওম মেহতা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়কে সংবাদমাধ্যমের অফিসগুলির বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার পরামর্শ দেন, যাতে কোথাও জরুরি অবস্থায় সংবাদ প্রকাশিত না হতে পারে। এছাড়াও রাজ্য সরকার কেন্দ্রের নির্দেশে সরকারি বিরোধী পত্রপত্রিকাগুলিতে বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দেওয়া ও খবরের ওপর সেন্সরশিপ বজায় রাখে।

কর্ণাটক : ২০১৮ সালের ১৩ নভেম্বর 'হোসা দিগন্ত' পত্রিকার সাংবাদিক সন্তোষ আন্মাইয়াকে টিপু সুলতান বিরোধী বক্তব্যের অভিযোগে কর্ণাটকের কংগ্রেস-জেডিএস সরকার গ্রেপ্তার করে।

মহারাষ্ট্র : মহারাষ্ট্রের পালঘরে সাধু হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে এই ঘটনায় কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীর নীরবতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার পর ২৩ এপ্রিল, ২০২০-র রিপাবলিক টিভি চ্যানেলের এডিটর অর্ণব গোস্বামী একদল কংগ্রেসকর্মীর আক্রমণের শিকার হন। মুম্বাইয়ের এনএম জোশীমার্গ থানায় অর্ণব গোস্বামীকে ২৭ এপ্রিল ১২ ঘণ্টা ধরে জেরা করে মুম্বাই পুলিশ। কংগ্রেসিরা অর্ণব গোস্বামীর বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ১৫০-এর বেশি এফআইআর দায়ের করে। ২০১৮ সালের অন্বয় নায়েকের আত্মহত্যার ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে ২০২০ সালের নভেম্বরে অর্ণব গোস্বামীকে তার মুম্বাইয়ের বাসভবন থেকে ফের গ্রেপ্তার করা হয়। এবং অন্যান্য অভিযোগে রিপাবলিক টিভির অন্য কর্মীরাও অনেকেই পরপর গ্রেপ্তার হন।

(তথ্যসূত্র : ক্রি প্রেস জার্নাল, ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ওপইন্ডিয়া, অর্গানাইজার, দ্য নিউইয়াক টাইমস্)

(১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থা স্মরণে প্রকাশিত)

বিচারপতি নিয়োগে কলেজিয়াম ব্যবস্থা ও সমকামী বিবাহ

সুদীপ নারায়ণ ঘোষ

ভূপিন্দর নাথ কৃপাল ভারতের ৩১তম প্রধান বিচারপতি ছিলেন ৬ মে, ২০০২ থেকে। ৭ নভেম্বর, ২০০২ অবসর গ্রহণ করেন। সেই বিচারকের ঘরে জন্ম নেয় নপুংসক পুত্র সৌরভ কৃপাল। তার দুই ভাই-বোন রয়েছে। সৌরভ কৃপালের সম্পূর্ণ শিক্ষা বিদেশে সম্পন্ন হয় এবং বিদেশে থাকার সময়, তার সমকামী সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল একজন বিদেশি নাগরিকের সঙ্গে। তিনি তার সঙ্গী নিকোলাস জার্মেইন ব্যাকম্যানের সঙ্গে গত ২০ বছর ধরে এই সম্পর্কে জড়িত রয়েছেন। নিকোলাস একজন ইউরোপীয় এবং সুইস ফেডারেল ডিপার্টমেন্ট অব ফরেন অ্যাফেয়ার্সে গুপ্তচর হিসেবে নয়াদিল্লিতে কাজ করেন। সৌরভ কৃপাল এই ব্যক্তিকে তার স্বামী এবং নিজেকে তার স্ত্রী বলে মনে করেন।

এ পর্যন্ত সবকিছু ঠিকঠাক ছিল, কারও কোনো সমস্যা হয়নি, কিন্তু বিচারকের এই নপুংশক পুত্র জোর দিয়ে বলেছেন আমিও বিচারক হতে চাই এবং তার জেদের পেছনে সেই বিদেশি শক্তিগুলো আছে যারা আমাদের আদালত ও সিস্টেমে ঢুকে এদেশের ব্যবস্থার মধ্যে গোলমাল পাকাতে চায়। সৌরভ কৃপাল সেই লোক যে ভারত থেকে ৩৭৭ ধারা বাতিল করিয়েছে নাজ ফাউন্ডেশন নামে একটি এনজিওর মাধ্যমে। সে নিজে এই সংস্থার পর্ষদ সদস্য।

এখন বুঝতে পারা যায় প্রথমেই ৩৭৭ ধারা কেন, কী কারণে বাতিল করা হয়েছিল। এখন নাজ ফাউন্ডেশন এবং অন্যান্য গ্রুপগুলো যারা সমকামী বিবাহকে বৈধতা প্রদানের জন্য আবেদন করেছে, সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের একটা দল, যাদের আমরা কলেজিয়াম সিস্টেম বলি, লিবারেল, বামপন্থী, অধ্যাপক, আইনজীবী ও নারীবাদী মহিলারাও— তারা সবাই ভয়ে সৌরভ কৃপালকে বিচারক বানানোর ব্যাপারে অনড়।

এর কারণ হলো এ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার এই সৌরভ কৃপালের ফাইল ৪ বার ফেরত দিয়েছে, যা কলেজিয়াম সিস্টেম অনুসারে সুপ্রিম কোর্ট সৌরভ কৃপালকে দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি নিয়োগ করতে সুপারিশ করে পাঠিয়েছেন। সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগের ব্যাপারে

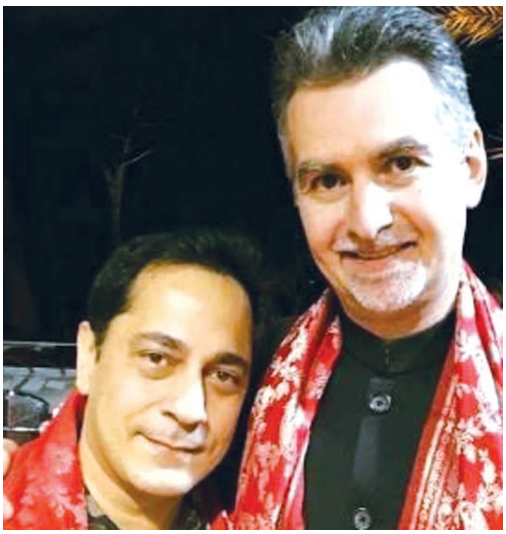

নিকোলাস ব্যাকম্যানের সঙ্গে সৌরভ কৃপাল।

কলেজিয়াম সিস্টেমও অনড় এবং বারবার সৌরভ কৃপালের ফাইল কেন্দ্রের কাছে পাঠায় যাতে কেন্দ্র তাকে বিচারক করতে রাজি হয়, এই লোকগুলোকে বাদ দিয়ে। এবং শেষ পর্যন্ত ভারত সরকার সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম সিস্টেমকে চিঠি দিয়ে বলেছিল যে 'আপনারা সৌরভ কৃপাল নামের ব্যক্তিকে বিচারক করার বিষয়ে অনড়। তবে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থার দেওয়া গোপন রিপোর্টে তার বিরুদ্ধে স্পষ্টভাবে লেখা আছে যে এই ব্যক্তিকে বিচারক করা হলে তা ভারতের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক হবে। কারণ এই ব্যক্তির সঙ্গে একজন বিদেশি নাগরিকের সম্পর্ক রয়েছে যিনি তার দেশের গোয়েন্দা সংস্থার অধীনে কাজ করছেন।' সরকার আরও বলেছে, 'আমরা এমন একজনকে ভারতের বিচারক হতে দিতে পারি না'।

এবং এই জবাবের সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার সুপ্রিম কোর্টের কাছে একটি গোপনীয় নথি আকারে সেই রিপোর্টটিও হস্তান্তর করে, যা ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা সৌরভ কৃপালের বিষয়ে অনেক চেষ্টা করে তৈরি করেছিল, যাতে সমস্ত আধিকারিক ও কর্মচারীদের নাম ছিল, সেই গোপন রিপোর্টও দেওয়া হয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার ও সুপ্রিম কোর্টের জন্য। কিন্তু যখন সুপ্রিম কোর্ট সেই রিপোর্ট পড়ে এবং কেন্দ্রীয় সরকারও সেটাকে জবাব হিসেবে পেশ করে, তখন সুপ্রিম কোর্ট এবং কলেজিয়াম সিস্টেম তাদের অহংকারে মত্ত হয়ে সেই গোপন নথিতে থাকা ভারতের গোয়েন্দা আধিকারিক ও কর্মচারীদের নাম প্রকাশ করে দেয় যা প্রশ্ন তুলে দেয় সব রকম মান্য, স্বীকৃত সরকারি ব্যবস্থাপনাকে অস্বীকার করার সুপ্রিমকোর্টের এই আচরণকে। যদিও সুপ্রিম কোর্ট-সহ কেউ তা করতে পারে না।

সেই গোপন রিপোর্ট পাবলিক ডোমেইনে দেওয়ার পিছনে সুপ্রিম কোর্ট কলেজিয়াম সিস্টেমের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য ছিল যে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থার সমস্ত অফিসার ও কর্মচারীরা

দুশ্চিন্তায় পড়ে যাবে এবং ভবিষ্যতে সুপ্রিম কোর্টের বিরুদ্ধে কোনও ধরনের রিপোর্ট তৈরি করতে পারবে না।

এটা বুঝতে পারা যায় যে সরকার যদি তাদের গোয়েন্দা সংস্থার লোকদের নাম প্রকাশ করে তাহলে প্রথমত তারা আর গুপ্তচর থাকে না। দ্বিতীয়ত, তাদের জীবনের ঝুঁকি হয়ে যায়। তৃতীয়ত, এখন পর্যন্ত তাদের সমস্ত কাজ গোপন ছিল। এখন যখন তা প্রকাশ হয়ে গেল এবং যখন অনেক লোক জানতে পারল যে এই সব ব্যক্তি ভারত সরকারের গুপ্তচর তখন যে কোনো শত্রু দেশ বা ব্যক্তি তাকে হত্যা করতে পারে। এমতাবস্থায় ভারতের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করতে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কে গুপ্তচর হবে?

সুপ্রিম কোর্টের এমন পদক্ষেপের নিন্দা করে ভারতের পূর্বতন আইনমন্ত্রী কিরণ রিজিজু কলেজিয়াম ব্যবস্থার অবসান ঘটাতে উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং একই সঙ্গে আইনমন্ত্রী সুপ্রিম কোর্টকে সতর্কও করেছিলেন যে, যদি আবার কোনো ধরনের গোপন প্রতিবেদন পাবলিক ডোমেইনে দেওয়া হয় তাহলে তা সঠিক হবে না।

এখান থেকেই সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম সিস্টেম তার অবস্থান পরিবর্তন করে এবং আরও এগিয়ে যাওয়ার জন্য তার নীতি পরিবর্তন করে এবং ৩৭৭ ধারা বিলুপ্ত করতে সফল গোষ্ঠী ও লোকেদের পুনরায় সক্রিয় করে বলা হয়— 'আসুন, সমকামী বিবাহকে বৈধ করার জন্য আবার একত্রিত হই।'

কিন্তু এসব করে সৌরভ কৃপাল কীভাবে বিচারপতি হবেন? এ বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের বিচারকরা পুরো সচেতন। 'আগে আমরা সমকামী সম্পর্ক বৈধ করব।' তারপরে সৌরভ কৃপাল এবং সেই বিদেশি দুজনেই বিয়ে করবেন, তারপর আইনত সৌরভ কৃপালকে সেই বিদেশির স্ত্রী বলা হবে এবং সে ভারতের নাগরিক হবে। তখন ভারত সরকার তাকে বিচারক হওয়া থেকে আটকাতে পারবেন না, কারণ এটা অনেক ক্ষেত্রেই হয়। এবং আমাদের আইনের পাশাপাশি সংবিধানেও বলা আছে স্বামী বা স্ত্রী উভয়েই যদি বিদেশি হয় তবে সরকার তাকে ভারতের নাগরিকত্ব দিতে অস্বীকার করতে পারে না।

এখন আমরা বুঝতে পেরেছি যে কেন সুপ্রিম কোর্ট সমকামী বিয়েকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য এত দ্রুত শুনানি করেছিল। সৌরভ কৃপালকে বিচারক বানাতে হবে কারণ আমাদের কলেজিয়াম ব্যবস্থায় অনেক বিচারক, সিনিয়র অ্যাডভোকেট, অনেক অধ্যাপক ও সমাজকর্মী আছেন যারা ভারতের জন্য ক্ষতিকর, এই ধরনের লোক বিদেশের পয়সায় বাড়ছে। এবং বিদেশে বসে তাদের প্রভুরা তাদের কোটি কোটি টাকা দেয় এবং তাদের ইচ্ছানুযায়ী ভারতের নিয়ম-নীতিতে এমন গোলমাল পাকায় যাতে ভারত ঘোর বিপদের মধ্যে পড়ে।

এখানে আরও কিছু উল্লেখযোগ্য বিষয় যা বিবেচনা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ : কিছু নপুংসক/'গে'/হিজড়া সমকামী দম্পতি একটি পিটিশন দায়ের করেছেন— একজন সাধারণ মানুষ বছরের পর বছর শুনানি পায় না কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট তাদের তাৎক্ষণিক শুনানির অনুমোদন দেয় এবং সাংবিধানিক বেঞ্চ গঠন করে। দামি আইনজীবীদের দল তার মামলা লড়ে। ভারতের প্রধান বিচারপতিও একতরফাভাবে এই নপুংসক গ্যাঙের পক্ষে মন্তব্য করেছেন। তবুও বলতে হবে এখানে অস্বাভাবিক কিছু নেই? আছে। ওকিজম বা জাগরণবাদ নামে এক পশ্চিমি সংস্কৃতির নতুন ধর্ম শুরু হয়েছে। সর্বত্র তা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ছে, সমাজকে নতুন করে গঠন করছে, নতুন সংজ্ঞা দিচ্ছে। এই ধর্ম সমবেদনা ও ন্যায়বিচারের মুখোশ পরে থাকে কিন্তু এর তলায় এক কু-মতলব থাকে। দাবি করা হয় এইসব ব্যাপার পশ্চিমি মূল্যবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সেখানেই সন্দেহ।

সেই জাগরণবাদীরা পুরো বিশ্বব্যবস্থাকে ভয়ানক র‍্যাডিকাল পথে পরিবর্তন করতে এবং লিঙ্গের ক্ষেত্রে আরও বিভেদ সৃষ্টি করতে ও মানুষকে নানাভাবে জ্বালাতন করার অভিপ্রায়ে এই অ্যাজেন্ডার নেতৃত্ব দিতে চায়। প্রতিষ্ঠিত সব সুন্দর ব্যবস্থাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে কালিমালিপ্ত করতে চায়। পাশাপাশি আমরা দেখেছি, সমগ্র বিশ্ব LGBTQIA+-এর অধিকারগুলোকে মান্যতা দেওয়ার চেষ্টা করছে যা মনস্তাত্ত্বিক বিকার ছাড়া কিছু নয় এবং তাদের মূলধারার একটি অংশ করে তোলার চেষ্টা চলছে। তাছাড়া স্কুল শিক্ষাও এই মতাদর্শে আক্রান্ত হচ্ছে। এর কেন্দ্রস্থল ইউএসএ। 'গো ওক' স্লোগান উঠেছে। যারা এই পরিস্থিতিতে বিচক্ষণতার বা মতিস্থিরতার কথা বলে তাদের রেসিস্ট বলে গালাগাল দেওয়া হয়, পুরো লবি তাদের পিছনে লাগে।

২-৩ বছর ধরে আমরা দেখেছি যে ভারতের কদর্য বলিউড কীভাবে এই সমকামী বিবাহের বিষয়টিকে প্রচার করছে এবং ভারতীয় শীর্ষ বিচার বিভাগও একে সায় ও মদত জোগাচ্ছে। তা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছে। বিজেপি সরকার সমলিঙ্গ বিবাহে তাদের আপত্তির কথা জানিয়েছে।

বিশ্ব আব্রাহামিক ও ঔপনিবেশিক শক্তির আক্রমণের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে ভারত। কারণ এখানেই এখনো মূর্তিপূজক আদি সনাতন ধর্মের অস্তিত্ব আছে। যেখানে অন্য সর্বত্র তা মুছে ফেলা হয়েছে। মার্কসবাদ থেকে আরম্ভ করে আর্য অভিবাসন তত্ত্ব সবই আসলে ভারতের সনাতন সংস্কৃতির মূলোৎপাটনের ষড়যন্ত্র। যথাক্রমে আড়াইশো কোটি ও দু'শো কোটি খ্রিস্টান ও ইসলামকে ওরা শেষমেশ ছোঁবে না। দুই সম্প্রদায়ের সেই অর্থ ও লোকবল আছে, আছে নিটোল সম্প্রদায়গত কাঠামো (অর্পণ থেকে অর্পিতা হয় কিন্তু ইমরান থেকে ইমরানা হয় না)। খ্রিস্টান দেশে শুরু হলেও এবং ইহুদিদের হাতে প্রচার হলেও সেখানে কিছু করবে না। মানুষকে শুধু নারী-পুরুষ নয়, আরও অসংখ্য ভাগে ভেঙে দিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত বৈবাহিক সম্পর্কে ফাটল ধরিয়ে সমাজকে লণ্ডভণ্ড করে লুটেপুটে শেষাবধি ভারত সংস্কৃতির অবসান ঘটানো এদের মুখ্য উদ্দেশ্য। দূরদর্শন ধারাবারিক লক্ষ্য করুন। সোশ্যাল প্লাটফর্মে নজর রাখুন। সেখানে এই সব LGBTQIA+ প্রচার পাচ্ছে। অশ্লীল নীল ছবির কুশীলবরা তারকার সম্মান পাচ্ছে। সনাতন কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার গোপন, মৃদু থেকে সোচ্চার প্রচারণা চলছে। বাংলা বা অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় দূরদর্শন ধারাবাহিক, চলচ্চিত্র, (উল্লেখ্য নগরকীর্তন সিনেমা) নাটক, গান, সংস্কৃতি-সহ জীবনের সর্বক্ষেত্রে এই বিকৃতি চালানোর চেষ্টা চলছে। এই সব চলচ্চিত্র ইত্যাদির পিছনে ঘুরপথে ওইসব দেশ থেকে টাকা আসে। বাজারচলতি অনেক পত্রিকা এর সমর্থক। যখন বিজেপি চালিত কেন্দ্র সরকার সামাজিক প্লাটফর্মে নীল ছবির অবাধ প্রদর্শন বন্ধ করেছিল তখন এই বাজারচলতি গোষ্ঠী তার প্রতিবাদ করেছিল পছন্দের স্বাধীনতার কথা বলে। ভারতের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের এ বিষয়ে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। □

করমণ্ডল আসলে পরিযায়ী এক্সপ্রেস ট্রেন

কটাক্ষ করে অনেকেই করমণ্ডল এক্সপ্রেসকে পরিযায়ী এক্সপ্রেস বলে। চেন্নাইগামী দ্রুতগামী এই ট্রেনটি সঙ্গতকারণেই এই নামের উপযোগী। পরিযায়ী শব্দটি অধিকমাত্রায় ব্যবহৃত হয়েছে করোনাকালে। তখনই জানা গেছে হাজার হাজার মানুষ কাজের খোঁজে এ রাজ্য ছেড়ে বিভিন্ন রাজ্যে পাড়ি দিয়েছে। কোভিড আতঙ্কে এরা ঘরমুখো হলে তখনই জানা গেল এ রাজ্যের কাজের সুযোগের করুণ দশা। পাঁচ দশক আগেও এ রাজ্যের এমন করুণ দশা ছিল না। সাড়ে তিন দশকের বাম শাসন এবং তারপর দেড় দশকের চুরি। অতীতে অনেক শিল্প এ রাজ্যে ছিল। বাঙ্গালি বেশি পরিশ্রমের কাজ করতে পারে না বলেই শ্রমিকদের সিংহভাগ চাহিদা পূরণ করেছে ভিন রাজ্যের, মূলত বিহার, ইউপি, ওড়িশা প্রভৃতি রাজ্য। পাট, লৌহ, ইস্পাত, দেশের অন্যতম গাড়িশিল্প, চর্মশিল্প, ঔষধশিল্প সব ছিল এই রাজ্যে। স্রেফ রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে বামেদের উগ্র ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন এই সব শ্রমনির্ভর শিল্পগুলিতে তালা ঝুলিয়ে দেয়। বাম শাসনের শেষলগ্নে বোধোদয় হয়ে টাটাদের শিল্প গড়ার এক মরিয়া প্রয়াস চালালেও সেই প্রয়াসে জল ঢেলে দিয়ে ক্ষমতায় বসেন মমতা ব্যানার্জি।

এ রাজ্যের কাজের হাল যে কতটা করুণ তার এক ছোট্ট উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। গত বছর আগস্টে বিশেষ প্রয়োজনে অযোধ্যায় যেতে হয়েছিল। ফেরার পথে স্টেশনে এক ফেরিওয়ালার সঙ্গে আলাপ হয়। বয়সে তরুণ এই ফেরিওয়ালা স্নাতক এবং বাড়ি মালদা জেলার এক প্রত্যন্ত গ্রামে। স্টেশনে অপেক্ষারত যাত্রী হিসেবে আমি আলাপচারিতায় মাতলাম যুবকের সঙ্গে। সে এই অযোধ্যা শহরে পুরোনো কাগজ, ভাঙা লোহা, সংসারের বাতিল বাসন সংগ্রহ করে বিক্রি করে। সঙ্গে গ্রামের দুই তিনজন আছে। তাদের জিম্মায় ব্যবসা দিয়ে যুবকটি বাড়ি ফিরছে পনেরো দিনের জন্য। তাকে তার রোজগারের কথা জিজ্ঞেস করতে সে বলল মাসে পনেরো হাজার টাকা এবং এর মধ্যে পাঁচ হাজার টাকা নিজের জন্য রেখে বাকি অংশ বাড়ি পাঠায়। শুধু তাই নয়, জম্মু তাওয়াই এক্সপ্রেসে ফিরছিলাম এবং আমার বগির প্রায় সব যাত্রীই পরিযায়ী শ্রমিক। এরা বেশিরভাগ উত্তরবঙ্গের। এরা কেউ আপেল বাগানে কাজ করেন, কেউ রাজমিস্ত্রি, আবার কেউ বা কাশ্মীর বা পঞ্জাবে, ইউপিতে কাজ করেন।

আমাদের দেশে সাড়ে চার কোটি তরুণ-তরুণী তাদের পরিবার ছেড়ে ভিনরাজ্যে যান রুজির খোঁজে। এরাই দেশের দশ শতাংশ জিডিপির অংশীদার। অথচ এরা যে এক্সপ্রেসে ট্রেনে ভ্রমণ করে বেশির ভাগই অসংরক্ষিত কামরায়। আর বড়োসড়ো রেল দুর্ঘটনায় মৃতদের তালিকায় এদের নাম থাকে না। তালিকায় এদের নাম না থাকায়, এদের পরিবার সরকারের সাহায্য পায় না। ২ জুন ওড়িশায় করমণ্ডলের যে ভয়াবহ দুর্ঘটনা হলো তাতে মৃতদের অনেকেই দুই গাড়ির পাঁচটি অসংরক্ষিত কামরার যাত্রী। এই যাত্রীদের আইডি কার্ড সঙ্গে থাকে না বা থাকলেও দেহ শনাক্ত করার সময়ে তা পাওয়া যায় না। ফলত তার পরিবার যেমন সরকারি সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়, তেমনি জীবনবিমা থাকলেও ক্ষতিপূরণ থেকে বঞ্চিত হয় এরা।

২০০১ সালে লোকগণনা অনুযায়ী ওই সালেই সাড়ে তিন কোটি মানুষ জীবিকার সন্ধানে অন্য রাজ্যমুখী। ২০১১ সালে এর সঙ্গে যুক্ত আরও ৫০ লক্ষ মানুষ। ২০১৩ সালের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে ওই সময়ে বেঙ্গালুরুর নাগরিকদের অর্ধেক পরিযায়ী শ্রমিক। পশ্চিমবঙ্গ থেকে অনেকেই কেরালায় যায় রাজমিস্ত্রির কাজে। সেখানে দৈনিক মজুরি ১২০০ টাকা হলে এ রাজ্যে চারশো টাকা। মজুরির এই বৈষম্যের জন্য অনেক সময়েই মানুষ ভিন রাজ্যে যায়। লোকগণনার তথ্য অনুযায়ী ২০০১ থেকে ২০১১ এই এক দশকে সাড়ে পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ ঘর ছেড়ে ভিনরাজ্যে গিয়েছে জীবিকার তাগিদে এরাজ্য থেকে। এদের অনেকেই দক্ষিণমুখী। গুজরাট বা মুম্বাইয়ের অলংকার শিল্পের শ্রমিকদের অনেকটাই দখল করেছে এ রাজ্যের পরিযায়ীরা। মেদিনীপুরের অনেক শ্রমিকের দক্ষতা ঈর্ষণীয়।

সূত্রের খবর যে, করমণ্ডলের দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে গোসাবার একই পরিবারের তিন ভাইয়ের। এঁরা যাচ্ছিলেন অন্ধ্রপ্রদেশে ধান রুইতে। রোজগার শূন্য এই পরিবারের পাশে কে দাঁড়াবে? পশ্চিমবঙ্গের সব দূরপাল্লার ট্রেন আজ পরিযায়ী এক্সপ্রেসে রূপান্তরিত, কেবল করমণ্ডল এক্সপ্রেসকে দায়ী করলে হবে না। রেল মন্ত্রণালয় আরও বেশি সজাগ হোক নিরাপদ যাত্রার। সেইসঙ্গে রাজ্য সরকারও সমানভাবে দায়ী সব নাগরিকের হাতে কাজের সুযোগ দিতে না পারার জন্য

—তারক সাহা,
হিন্দমোটর, হুগলী।

রাষ্ট্রপতি-ভবন প্রাঙ্গণে মসজিদ স্থাপন কি ধর্মনিরপেক্ষতা?

ভারতীয় অধিকাংশ হিন্দু পেশাদার রাজনীতিক ক্ষমতায় যেতে কিংবা সেখানে টিকে থাকতে তাঁদের ধর্মনিরপেক্ষতা প্রমাণের জন্য ইসলাম তোষণকে মজ্জাগত করেছে। তাতে দেশ ও জাতির যে কতটা অধোগতি হচ্ছে, ইসলামি শাসনের দিকে যাচ্ছে, সেটা তাঁদের নিকট তুচ্ছ এবং ইসলাম সম্পর্কে চরম অজ্ঞতার পরিচায়ক। একটা বড়ো মাপের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। ভারতের তৃতীয় রাষ্ট্রপতির পদে বসানো হলো (১৯৬৭-৬৯) বর্ণচোরা সাম্প্রদায়িক ড. জাকির হোসেনকে। তিনি দেশের জন্য কী মহান ভূমিকা রেখে গেছেন জানি না, তবে ইসলামের খুঁটি গাড়তে রাষ্ট্রপতি ভবন প্রাঙ্গণে একখানি মসজিদ তৈরি করে দিয়ে গেছেন।

অতএব, আমরা ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের সংবিধান অনুযায়ী দেশের জনগণকে জোর আহ্বাহান জানাচ্ছি, হিন্দু-সহ সকল ধর্মের মন্দির

স্থাপন করে রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতা প্রমাণের প্রবল আন্দোলন গড়ুন। এবং সরকার কোনো একটি ধর্মের তোষণ না করে দেশের ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রাখুক।

—**কমলাকান্ত বণিক,** দত্তপুকুর, উত্তর ২৪ পরগনা।

ভারতের স্বাধীনতা এবং ভারতের সংবিধান

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট আমাদের দেশ ভারতবর্ষ সাতশো বছর পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পেয়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। কিন্তু স্বাধীনতার আগে মুসলিম লিগ নেতা মহম্মদ আলি জিন্নার দাবির কাছে নতি স্বীকার করে ভারতের এক তৃতীয়াংশ মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তান গঠিত হলো। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী প্রথমে ভারত ভাগের বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু পরে জিন্নার দাবির কাছে নতি স্বীকার করে ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ স্বীকার করে নিয়েছিলেন। ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ হলো কিন্তু ধর্মের ভিত্তিতে লোক বিনিময় হলো না। গান্ধীজী বললেন ধর্মের ভিত্তিতে লোক বিনিময় আমি চিন্তাও করতে পারি না। আশ্চর্য! ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হতে পারে কিন্তু ধর্মের ভিত্তিতে লোক বিনিময় হতে পারে না। এদিকে তখন ভারতের অংশে বসবাসকারী মুসলমানদের অনেকেই তখন পাকিস্তানে চলে যেতে চাইছিলেন। কিন্তু মুসলিম লিগ নেতা জিন্না নির্দেশ দিলেন তাদের ভারতেই বসবাস করতে। তিনি বলেছিলেন, 'এই পোকায় কাটা দু'টুকরো অংশের জন্য আমরা মুসলমানরা পাকিস্তানের দাবিতে লড়াই করিনি। আমাদের লক্ষ্য দিল্লি।

অতএব, ভারতের অংশে থাকা মুসলমানরা সক্রিয় হলেন পুরো ভারতকে ইসলামিক দেশে পরিণত করতে। পাকিস্তান হলো ঘোষিত ইসলামিক দেশ। কিন্তু ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্র ঘোষণা করা হলো না। ভারতে সবার সমান অধিকার। এরপর ১৯৫০ সালে বাবাসাহেব আম্বেদকরের নেতৃত্বে ভারতের সংবিধান প্রকাশিত হলো। ভারতের সংবিধানের কয়েকটি ধারায় উল্লেখিত হলো কোনও মিশনারি স্কুলে ধর্মীয় শিক্ষা অর্থাৎ বাইবেল পড়ানো যাবে, মাদ্রাসা ও মক্তবে কুরআন শরিফ, হাদিস পড়ানো যাবে। সরকারি অনুদান পেতে কোনও অসুবিধে হবে না। কিন্তু হিন্দুরা তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে যদি ধর্মীয় শিক্ষা দেয় তাহলে ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি সব রকম সরকারি অনুদান থেকে বঞ্চিত হবে। কী চমৎকার! তাই না। এরপরে ইন্দিরা গান্ধীর প্রধানমন্ত্রিত্বকালে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুযোগে ভারতকে পুরোপুরিভাবে ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ঘোষণা করা হলো। অর্থাৎ শেষ পেরেকটিও মারা হলো।

—**শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,**
ডেজিরে কমপ্লেক্স, বড়বাজার, চন্দননগর।

স্মার্ট দেশ গড়তে স্মার্ট যুবশক্তি চাই

প্লেটো নাকি বলেছিলেন, মানুষ যেমন হবে, দেশও তেমনই হবে; মানুষের চরিত্র দ্বারাই দেশ গড়ে ওঠে। বাংলাদেশকে সবাই একটি চমৎকার, ভালো দেশ হিসেবে দেখতে চায়, সেজন্যে দেশের মানুষগুলোকে তো ভালো হতে হবে, তাই না? বঙ্গবন্ধু 'সোনার বাংলা' গড়তে চেয়েছিলেন, তখন বলা হয়েছিল, সোনার বাংলা গড়তে 'সোনার মানুষ' চাই। সোনার মানুষ ছিল না, তাই সোনার বাংলা হয়নি। দেশবাসী যেমন, দেশটিও তেমন। বাঙ্গালি অন্যকে দোষ দিতে পারদর্শী, সবকিছুর জন্যে সরকারকে দোষ দেওয়া বাঙ্গালির স্বভাব, অথচ যিনি দোষ দিচ্ছেন, তিনি কিন্তু তাঁর দায়িত্বটি ঠিকমতো পালন করছেন না?

দেশে 'ঘুষ' একটি সর্বজনীন ব্যবস্থা, কেন? কারণ প্রায় সবাই খায়! ক্ষেত্র বিশেষে খেতে না চাইলেও খেতে হয়! সরকার চাইলেও এটি বন্ধ করতে পারবে না। কারণ সমাজটা এভাবেই গড়ে উঠেছে এটি সামাজিক দায়িত্ব। ঘুষখোরকে সবাই চেনে কেউ ঘৃণা করে না। দেশে ৫শো টাকা চুরি করা চোরকে গাছে বেঁধে পেটানো হয়, ৫ হাজার কোটি টাকা চোরকে সবাই 'স্যার' বলে। দেশে নির্বাচন নিয়ে বদনাম আছে। বলা হয়, সরকার প্রভাব খাটায়। ক্ষমতায় টিকে থাকতে যে কোনো সরকারই প্রভাব খাটাতে চাইতে পারে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো নির্বাচন কমিশন কি রুখে দাঁড়িয়েছে? টিএন সেশন নামে ভারতের এক প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নাম আমার মনে আছে, তিনি অনেক নির্বাচনী সংস্কার করেছিলেন। তাই বলছিলাম দায়িত্ব নিতে হয়।

জানি বলবেন, গুম হয়ে যাবেন মিথ্যা মামলায় জেল হবে। হোক না, উচ্চ পদ যখন নিয়েছেন, উচ্চ দায়িত্বও তো নিতে হবে। কেউ কি বলবেন, বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচন করতে গিয়ে আজ পর্যন্ত কোনো নির্বাচন কমিশন জেল খেটেছেন বা গুম হয়েছেন বা নিহত হয়েছেন? তাই 'আসুন, আমরা আয়নায় নিজের চেহারাটা দেখি, নিজেকে প্রশ্ন করি, আমি কি সঠিক? প্লেটোর কথায় আসি, মানুষের চরিত্র দ্বারাই দেশ গঠিত হয়, সুতরাং বাংলাদেশ নামক দেশটি জনকল্যাণমূলক দেশ হিসেবে পেতে চাইলে, নাগরিকের চরিত্র কল্যাণমূলক হতে হবে, নিজ নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে হবে, মানুষ ভালো হলে দেশ ভালো হতে বাধ্য। এটিও সত্য, শাসন ব্যবস্থা দেশের নাগরিকদের বা সমাজকে সুন্দরভাবে পরিচালিত করতে পারে।

দেশ যদি মানুষের নাগরিক অধিকারগুলো নিশ্চিত করে, অর্থাৎ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, জীবিকার গ্যারান্টার হয়, অধিকাংশ মানুষ এমনিতেই ভালো হয়ে যাবে। আজকাল স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার কথা শোনা যাচ্ছে, এজন্যে স্মার্ট যুবসমাজ দরকার হবে, তা কি আছে? স্বীকার করুন বা না করুন, দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার মান অতিশয় নিম্ন। তরুণ সমাজ বিদেশ-মুখী। সামাজিক নিরাপত্তার অভাব। অনুকরণীয় আদর্শ বা ব্যক্তিত্ব নেই। সমাজের সর্বত্র ভোগ, ত্যাগের কোনো বালাই নেই। ধর্মের ঢোল পিটিয়ে, ফেইসবুক, টিকটক ভিত্তিক স্মার্টনেস দিয়ে কি স্মার্ট দেশ গড়া সম্ভব?

—**শিতাংশু গুহ,**
নিউইয়র্ক, ইউএসএ।

অঙ্গনা

বিবাহ বিচ্ছেদ এড়াতে মেয়েদেরও সহিষ্ণুতা প্রয়োজন

শবরী ঘোষ

এই লেখার শিরোনাম দেখে অনেক মেয়ে ক্ষুব্ধ হতে পারেন। প্রথমেই সবিনয়ে জানাই, আজকের ভোগবাদী দুনিয়ায় বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যা ক্রমাগত যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে তার জন্য কোনো ভাবেই একতরফা মেয়েদের দায়ী করা যায় না। দাম্পত্যজীবন সফল করতে গেলে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের সদিচ্ছা, বন্ধুত্ব, সহমর্মিতা, পারস্পরিক বোঝাপড়া ইত্যাদি গুণগুলির একান্ত প্রয়োজন। ভারতবর্ষের মতো দেশে এর পাশাপাশি দুইজনের পারিবারিক মূল্যবোধও একটা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অনেক সময় বিবাহবিচ্ছেদের পেছনে স্বামীর অত্যাচার, একাধিক নারীর সঙ্গে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক বা শ্বশুরবাড়ির নির্যাতন কারণ থাকে। কিন্তু একথা স্বীকার করে নিয়েও বলা যায় যে, বহু ক্ষেত্রে মেয়েদের সহিষ্ণুতার অভাবও কিন্তু বিবাহবিচ্ছেদের জন্য দায়ী থাকে।

পাশ্চাত্যের 'নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি'-র ধারণায় অন্ধভাবে প্রভাবিত কিছু মেয়ে বিয়ের পর কিছুতেই স্বামীর পরিবারের সঙ্গে একত্রে বসবাস করতে চায় না। আজকাল বহু পরিবারেই একটিমাত্র কন্যাসন্তান রয়েছে। তাদের কারো কারো বক্তব্য হলো যে, বিয়ের পরেও বাবা-মা'কে দেখভাল করার জন্য তাদের বাপের বাড়িতেই থেকে যেতে হবে। কিন্তু সত্যিই কি তাই হয়? কোনো মেয়ের যদি বাবা-মায়ের সেবা করার প্রকৃত সদিচ্ছা থেকে থাকে তাহলে সে শ্বশুরবাড়ির প্রতি যাবতীয় দায়দায়িত্ব পালন করেও সেই কাজ করতে পারে। প্রয়োজনে মেয়েটি বাবা-মা'কে নিজের শ্বশুরবাড়িতেও থাকতে বলতে পারে। আবার মেয়েটির বাবা-মায়ের যদি তার শ্বশুরবাড়িতে থাকতে আপত্তি থাকে তবে সে প্রয়োজনে প্রতিদিন বাপের বাড়িতে যাতায়াত করেও তাঁদের দেখভাল করতে পারে। শ্বশুর ও শাশুড়িকে যদি মেয়েরা নিজেদের জন্মদাতা বাবা-মায়ের মতো শ্রদ্ধা ও সমাদর করতে পারে তবে বিবাহিত জীবন তাঁদের সস্নেহ আশীর্বাদ ও সাহচর্যে সফল হতে পারে। অনেক মেয়ে আবার বিয়ের পর নিজেদের স্বাধীন 'স্পেস' দাবি করে। শ্বশুরবাড়িতে থাকলে নাকি তাদের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হবে! প্রশ্ন হলো, এই মেয়েরা স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতা শব্দ দুটিকে কি সমার্থক বলে মনে করে? উচ্চবিত্ত পরিবারগুলির পাশাপাশি আজকাল মধ্যবিত্ত পরিবারের কিছু মেয়ের মধ্যেও এই বাতিক দেখা দিয়েছে। এটা ডিভোর্সের অন্যতম কারণ। শ্বশুর-শাশুড়ি বিয়ের পর রুচিশীল পোশাক পরতে বলছেন, বিনা প্রয়োজনে মধ্যরাত পর্যন্ত বাড়ির বাইরে থাকলে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা আপত্তি করেন, পুত্রবধূ ধূমপান বা মদ্যপান করলে শাশুড়ি পছন্দ করেন না— এইসব ঘটনা ডিভোর্স পর্যন্ত গড়াচ্ছে। এক্ষেত্রে মেয়েদের প্রধান অভিযোগ হলো তাদের স্বামীরা নাকি নিজের বাবা-মা'র প্রতি এতটাই অনুরক্ত যে তাদের কথার কোনো মূল্যই থাকে না। ধূমপান বা মদ্যপানের কুফল অথবা মধ্যরাতে ফাঁকা শহরে নিরাপত্তাহীনতার বিষয়টি এসব মেয়েরা ভেবে দেখতে পারেন। আর রুচিশীল পোশাকেও কিন্তু নিজেকে শোভন ও প্রগতিশীল বলে হাজির করা যায়। তাছাড়া মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। 'স্পেস' দাবি করে শ্বশুরবাড়ি থেকে আলাদা হলেও সমাজ থেকে আলাদা হতে পারবেন কি?

উচ্চাকাঙ্ক্ষা অনেক সময় ডিভোর্সের কারণ ঘটায়। শুনতে কুরুচিকর হলেও একথা সত্য যে কিছু কিছু বিবাহিতা মহিলা শুধুমাত্র অফিসে পদোন্নতির জন্য ঊর্ধ্বতন পুরুষ কর্মচারীদের সঙ্গে অশোভন সম্পর্কে লিপ্ত হতে দ্বিধা করে না। কেউ কেউ আবার কর্মক্ষেত্রেই নিজেদের যাবতীয় সময়, উৎসাহ, উদ্দীপনাকে ব্যয় করে। স্বামী বা সন্তানের জন্য প্রয়োজনীয় কর্তব্যটুকু পালনে ততটা আগ্রহ নেই। আবার অনেকে এতটাই বেশি কেরিয়ার সর্বস্ব যে, বিবাহিত জীবনে তারা সন্তান কামনা করে না। কিন্তু কেরিয়ারমুখী হতে গিয়ে তারা যেন যন্ত্রমানবী না হয়ে যায়। সংসারে অর্থের যেমন প্রয়োজন, তেমন কিন্তু 'ইমোশন' বা আবেগেরও মূল্য আছে। খ্যাতির চূড়ায় পৌঁছে গিয়ে যেন নিজেকে বড়ো একাকী না মনে হয়। হাজার ডিপ্রেশনের ওষুধও কিন্তু সেই মানসিক নিঃসঙ্গতাকে দূর করতে পারবে না।

সম্পর্ক ভেঙে দেওয়া কাঁচের গ্লাস ভাঙার থেকেও অনেক সহজ কাজ। যে সম্পর্ক শুধু বেদনা দেয়, সেই সম্পর্ককে জোর করে টিকিয়ে রাখা অর্থহীন এ কথা সত্য। কিন্তু খারাপ মানুষের চরিত্রও অনেক সময় ভালো মানুষের সংস্পর্শে এসে পালটে যায়। কাজেই অন্তত একবারের জন্য হলেও মেয়েদের সেই চেষ্টা করা উচিত। আমাদের দেশে মেয়েরা মাতৃরূপে পূজিতা হন। মা তাঁর স্নেহ, মমতা, ধৈর্য, সহিষ্ণুতার দ্বারা সন্তানের মানবিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটান।

বিয়ের পর মেয়েরা যদি একটু বেশি সহিষ্ণুতা দেখান, তবে অনেক ক্ষেত্রেই ভাঙনের মুখে এসেও সম্পর্ক টিকতে পারে। স্বামী বা শ্বশুরবাড়ির লোকদের অপমান মুখ বুজে হজম করা নয়। কিন্তু কথায় কথায় ৪৯৮-এর ভয় দেখানো বা ডিভোর্স করাটাও নারী স্বাধীনতার সমার্থক নয়। ■

ডিমেনশিয়ার চিকিৎসা এখনো পরীক্ষানিরীক্ষার স্তরেই রয়েছে

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

স্মৃতিভ্রংশ হওয়া মানে একপ্রকার অপরের উপরে নির্ভরশীল হয়ে পড়া। কারণ এই রোগে আক্রান্তেরা ধীরে ধীরে স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে ভুলে যান। ডিমেনশিয়া বা স্মৃতিভ্রংশের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রভাবও যথেষ্ট। অনেক সময়ে রোগীরা মৌলিক অধিকার থেকেও বঞ্চিত হন। দিন দিন বেড়ে চলেছে ডিমেনশিয়া আক্রান্তের সংখ্যা। ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের স্মৃতি ক্রমশ দুর্বল হতে থাকে। যদিও স্মৃতি দৌর্বল্য একটি উপসর্গ মাত্র। এই রোগে আক্রান্ত হলে ধীরে ধীরে চিন্তাভাবনার শক্তি নষ্ট হয়। কাজ করার প্রবণতা নষ্ট হয়। রোগীরা হিসেব করতে পারেন না। শেখার ক্ষমতা চলে যায়। ভাষার ক্ষেত্রে সমস্যা হয়। লোপ পেয়ে যায় বিচারবুদ্ধি। তবে রোগীর সচেতনতা পুরোমাত্রায় বজায় থাকে। ডিমেনশিয়ার কারণ বিভিন্ন রোগ বা কোনও আঘাত। এগুলো প্রাথমিক ভাবে বা পরোক্ষে মস্তিষ্কের ক্ষতি করে।

সাধারণত ডিমেনশিয়া বয়স্কদের হয়ে থাকে। এর ফলে বয়স্করা অক্ষম হয়ে পড়েন। তাঁদের নির্ভর করতে হয় অন্যের উপরে। এই রোগে শুধু রোগীর সমস্যা নয়, পরিবারের উপরে এর প্রভাব পড়ে। প্রায়ই দেখা যায়, ডিমেনশিয়ার বিষয়ে যথেষ্ট সচেতনতা নেই পরিবারগুলোয়। তার ফলে রোগের ডায়াগনোসিস এবং পরিষেবার ক্ষেত্রে সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

ডিমেনশিয়ার লক্ষণ ও উপসর্গ : স্মৃতিভ্রংশ ব্যক্তি বিশেষে আলাদা হতে পারে। আলাদা পথে আসতে পারে। প্রভাবটা নির্ভর করে রোগের প্রভাব কী রকম এবং রোগাক্রান্ত হওয়ার আগে সেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব কেমন ছিল তার উপরে। তবে আগে থেকে রোগের

কিছু লক্ষণ প্রকাশ পায় তিনটি পর্যায়ে।

প্রথম পর্যায়টিকে সকলেই অবহেলা করেন। কারণ লক্ষণ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই পর্যায়ের লক্ষণগুলো হলো, ভুলে যাওয়া। কোনও কিছু মনে রাখতে সমস্যা হয় রোগীর। আর একটি লক্ষণ সময়ের হিসেবনিকেশ না থাকা। রোগীর অনেক সময়েই নিজের পরিচিতি জায়গা অপরিচিত লাগে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে উপসর্গ হলো, রোগী সাম্প্রতিক কোনও ঘটনার কথাও মনে রাখতে পারে না। এবং ভুলে যেতে থাকেন লোকের নাম। ঘরেও নিজেকে অপরিচিত বলে মনে হয়। ধীরে ধীরে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ করাটা কঠিন হয়ে যায়। নিজের সাধারণ কাজেই অন্যের উপরে নির্ভরতা বাড়ে। রোগের আরও বৃদ্ধিতে রোগীর ব্যবহারিক পরিবর্তন হতে থাকে।

শেষ পর্যায়ে রোগী অন্যের উপরে প্রায় নির্ভরশীল হয়ে পড়েন এবং সক্রিয়তা কমে যায়। স্মৃতির বিভ্রাট প্রবল ভাবে বেড়ে যায়। এর সঙ্গে রোগের শারীরিক লক্ষণগুলো আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রোগী পুরোপুরি স্থান ও কাল ভুলে যান। আত্মীয় ও বন্ধুদের চিনতে কষ্ট হয় রোগীর। সমস্ত কাজেই সহায়ক লাগে। রোগী হাঁটতে চলতে পারেন না।

রোগের চিকিৎসা :

এখনও পর্যন্ত ডিমেনশিয়ার কোনও চিকিৎসা নেই। বেশ কিছু নতুন চিকিৎসা পরীক্ষা নিরীক্ষা স্তরে রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ডিমেনশিয়া আক্রান্তদের যত বেশি সহযোগিতা করা যায় এবং তাঁদের জীবনযাপনের উন্নতি ঘটানো যায় সেই প্রচেষ্টা করা হয়।

বয়সই ডিমেনশিয়ার ক্ষেত্রে বেশি আশঙ্কার কারণ। কিন্তু ৬৫ বছরের আগেও স্মৃতিভ্রংশে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। রোগীদের ৯ শতাংশের বয়স ৬৫ বছরের কম। বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে ডিমেনশিয়া রোখার কিছু ইঙ্গিত মিলেছে। সমীক্ষা অনুযায়ী বিভিন্ন ব্যায়াম করলে, ধূমপান না করলে, মদ্যপান বেশি না করলে এইসব ঝুঁকি এড়ানো যায়। ওজন কমানো, স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া এবং স্বাস্থ্য ঠিক রাখা জরুরি। এছাড়াও কিছু রোগী রয়েছে যাদের অবসাদ থাকে তারা ডিমেনশিয়ার শিকার হতে পারেন। কম পড়াশোনা করা, সামাজিক ভাবে মেলামেশা কম করা বা কম সক্রিয়তার কারণে ডিমেনশিয়ার ঝুঁকি বাড়ে।

সারা বিশ্বে কয়েক কোটি ডলার খরচ হয় রোগীদের পরিষেবা দিতে। ডিমেনশিয়া রোগীদের ক্ষেত্রে একটি সমস্যা প্রবল ভাবে অনুভূত হয়। তা হলো তাঁরা সাধারণ মানুষের মতো মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা পান না। এর জন্য দেশের নিয়ম তৈরি করা প্রয়োজন। এবং আন্তর্জাতিক মানের মানবাধিকার আইন দরকার। সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ডিমেনশিয়া রোগীদের পরিষেবা প্রদানের একটি নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে। ◻

বিরোধীদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা স্পষ্ট করে দিল করমণ্ডল

বিরোধীরা সংবাদমাধ্যমে মোদীর নিন্দা করেছেন। কিন্তু ঘটনাস্থলে যাননি, বা সাহায্যের হাত বাড়াননি। তারা প্রশ্ন তুলছেন এই পরিকাঠামোয় কোন আক্কেলে চলবে বন্দে ভারত! তবু সহযোগিতার বার্তা প্রশস্ত করেননি।

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

স্তব্ধ আকাশ। ক্রমশ আর্তের কান্নায় ভারাক্রান্ত চারদিক। ভারাক্রান্ত সারা দেশ। ২ জুন, করমণ্ডল এক্সপ্রেসের অবর্ণনীয় দুর্ঘটনা যেন আবার মনে করিয়ে দিল করমণ্ডলের পোড়া কপালের ইতিহাস। যে আতঙ্কিত করা দুর্ঘটনা ২ জুন ঘটল তা শুধু করমণ্ডলের বিপর্যয় নয়। বিপর্যয়ের মুখে একই সময়ে তিনটি রেলগাড়ি। দুটি যাত্রীবাহী এবং একটি মালবাহী। সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ২৮৮ জন। আহত আনুমানিক ১০০০। হাওড়ার শালিমার থেকে চেন্নাইয়ের উদ্দেশে রওনা হয়েছিল করমণ্ডল। ১২৮৪১ আপ করমণ্ডল যা ২৩ কামরার যাত্রী নিয়ে চলছিল। সন্ধ্যা ৬টা ৫৫ মিনিট নাগাদ ওড়িশার বালাশোরের কাছে সংঘর্ষ হলো করমণ্ডল, বেঙ্গালুরু-হাওড়া যশবন্তপুর এক্সপ্রেস এবং একটি মালবাহি গাড়ির। সরাসরি ধাক্কায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করমণ্ডল। ভারতের রেল দুর্ঘটনায় কালো দিন তৈরি করল করমণ্ডল ট্র্যাজেডি।

তবে করমণ্ডলের সঙ্গে এটাই যে প্রথম দুর্ঘটনা নয়। ২০০২-এর ১৫ মার্চ, তখন মমতা ব্যানার্জি ছিলেন রেলমন্ত্রী। দুপুর ২টো নাগাদ অন্ধ্রপ্রদেশের নেল্লোরের কাছে একটি রেল ব্রিজ থেকে সাতটি কামরা ছিটকে পড়েছিল। হতাহতের সংখ্যা ছিল না কিন্তু বহু মানুষ গুরুতর আহত হন। রেল লাইনের করুণ হাল ছিল মূল কারণ। আবার দুর্ঘটনা ঘটল ২০০৯-এর ১৩ ফেব্রুয়ারি।

সেদিনও দুর্ঘটনার স্থান ছিল ওড়িশা। জাজপুরের কাছে ইঞ্জিন এক লাইনে উঠে গেলে রেল কামরাগুলি ছিটকে যায়। এও কি কাতাতালীয়, যে করমণ্ডল আর ওড়িশার মধ্যে যেন একটা বিবাদ। যে কোয়ালিটির রেল লাইনে আরও অন্যান্য সুপার ফাস্ট ট্রেন চলে তাদের সঙ্গে লাইনচ্যুত করমণ্ডলের লাইনের গুণগত কোনো তফাত নেই। ১৯৭৭-এ করমণ্ডল চলতে শুরু করেছিল। প্রথম দুর্ঘটনায় পড়ল সেই বছরের স্বাধীনতা দিবসের দিন। সেবার ডাউন ১২৮৪২ করমণ্ডল মুখোমুখি ধাক্কা খেয়েছিল আপ করমণ্ডল ১২৮৪১-এর সঙ্গে। ওড়িশার ব্রহ্মপুরের কাছে সেই দুর্ঘটনায় ৭৫ জন যাত্রী নিহত হন। ২০১২-র ১৪ জানুয়ারিতে চলমান করমণ্ডলে আগুন লাগে। কারণ পরিষ্কার বোঝা যায়নি। সৌভাগ্য যে কারোর প্রাণনাশ হয়নি। এবার এই প্রাণ ওষ্ঠাগত গ্রীষ্মে কি দেবতা এতটাই অপ্রসন্ন যে এতবড়ো রেল দুর্যোগ! এত বুকফাটা কান্না।

এক নিমেষে স্তব্ধ হলো সেই সব মানুষদের আশা-নিরাশা যারা কাজের জন্য ভিন রাজ্যে ছুটছিলেন। কেউ চিকিৎসার জন্য। কেউ অন্য দরকারে। ভারতীয় রেল এ দেশের মানুষের সঙ্গে মানুষকে, প্রদেশের সঙ্গে প্রদেশকে দেহের শিরা ধমনীর মতো যুক্ত রাখে। করমণ্ডল দুর্যোগ যে সেই ধমনীর অনেক রক্ত ক্ষরণ ঘটাল। রেল দুর্ঘটনার পর একদিকে যখন সবার মন ভারাক্রান্ত, সেই মনেই বিদ্যুৎ গতিতে চলেছে উদ্ধারের কাজ। যন্ত্রণায় যা যা ভাবে উপশম দেওয়া যায় চলছে আপ্রাণ সব প্রচেষ্টা। তার মাঝেই শুরু হয়ে গেল রাজনৈতিক কচকচানি। ভারতের বিরোধী দল বিশেষ করে কংগ্রেস এবং রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস ভারতীয় রেলের অপদার্থতা এবং রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের দিকে আঙুল তুলছে। রেলমন্ত্রীর পদত্যাগ চাইছে কংগ্রেস। হাজার তিরস্কারেও দায়িত্ব থেকে বিচ্যুত হননি রেলমন্ত্রী। দুর্ঘটনার পর মুহূর্তে তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং টানা ৫১ ঘণ্টা ফিল্ডে হাতে হাত দিয়ে উদ্ধার যুদ্ধে শামিল হন। খতিয়ে দেখেছেন রেলের প্রাথমিক কী কী ত্রুটি ছিল। বিরোধীরা কেন্দ্রের তুলোধনা করার এক মোক্ষম সুযোগ তো পেলই। তাই যতক্ষণ না পর্যন্ত তদন্তের রিপোর্ট জমা পড়ছে ততক্ষণ একটা ট্র্যাজেডিকে ওরা রাজনৈতিক ময়দানে আনতে একটুও দ্বিধাগ্রস্ত হবেন না। একবারও নৈতিকতায় বাধবে না— সবকিছু রাজনীতির উপকরণ নয়। রেলের এক আধিকারিক বলছেন, 'What is the next thing we need to do and what is the next plan that exactly how the minister works, this was no different.' অশ্বিনী বৈষ্ণব পদত্যাগ করবেন কী করবেন না তা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গ, কিন্তু সেই অবিরাম ৫১ ঘণ্টাতে তিনি কী কী করলেন তা নিয়েও কিছু আলোচনা করি।

প্রায় ২৩০০ সদস্যের টিমকে তিনি পরিচালনা করেন। তৈরি হলো ৮টি বিশেষ টিম, প্রতিটিতে অন্তত ৭০ জন সদস্য। প্রতি দুটি টিমের তত্ত্বাবধানে একজন সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার, যারা পরিচালিত হলেন একজন ডি আর এম এবং একজন জিএম কর্তৃক। এবং সবার ওপর অবশ্যই রেল বোর্ড। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছিলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী। অনেকেই এই দুর্ঘটনার জন্য রেলের ইন্টারলকিং সিস্টেমকে দায়ী করছেন। পুরো বিষয়টাই তদন্ত সাপেক্ষ। যার ফলে সিবিআই-কে তদন্তভার ন্যস্ত করা হয়। সংকেত দেওয়ার পর আবার সেই সংকেত তুলে নেওয়া হয়। ট্রেনটি তখন স্টেশন এলাকার অতিরিক্ত লাইনে অর্থাৎ লুপ লাইনে ঢুকে পড়ে। সেখানে আগে থেকেই ছিল একটি মালবাহী গাড়ি, ফলে দুর্ঘটনার শিকার হয় করমণ্ডল।

কিন্তু এত সরলীকৃত করা যাবে না এই বিষয়টি। তাই খুব স্বাভাবিক ভাবেই সিবিআই-কে তদন্তের ভার দেওয়া হয়েছে। সিবিআই বিষয়েও বিরোধীরা সরব। সিবিআই ১০০ শতাংশ তদন্ত সাফল্য সত্যিই দিতে পারে না। এখন প্রশ্ন, তবে তদন্তের ভার কে নেবে? কাকে দেওয়া উচিত? সুচিন্তিত যে কোনও মানুষ সিবিআই তদন্তই চাইবেন, কারণ কোনও রাজ্য তদন্ত সংস্থার কাজ নয় এ ধরনের বিষয়ের তদন্ত করা। প্রশ্ন উঠছে, টেকনিক্যাল বিষয় কেমন করে সিবিআই দেখবে। প্রসঙ্গত, টেকনিক্যাল এরর দেখার কাজ সিবিআই করবে না। সিবিআই যে যে ধারায় এফআইআর করে তদন্তে শুরু করল তা হলো ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৩৭, ৩৩৮, ৩০৪-এ ও ৩৪ নম্বর ধারা। প্রাথমিকভাবে যে কেউই দেখতে পাচ্ছেন এ ছিল সংকেতের গোলমাল। কিন্তু এর পিছনে কোনও নাশকতা ছিল কিনা তা দেখার জন্যই সিবিআই। নাশকতার সম্ভাবনা কেউই উড়িয়ে দিতে পারছেন না। কারণ রেলের একটা ইন্টারলকিং সিস্টেম কখনও ব্যর্থ হলে তখন আর একটি সিস্টেম সাধারণত কার্যকর হয়। যাকে বলা হয় 'ফেল-সেফ'। যদি সেটাও ব্যর্থ হয় তখন নির্দিষ্ট ট্রাকের সব সিগন্যাল লাল হয়ে যায়।

করমণ্ডল দুর্ঘটনা কিন্তু আগের করমণ্ডল দুর্ঘটনাগুলির মতো লাইনচ্যুত হওয়ার মতো নয়। এক্ষেত্রে কিন্তু সিস্টেমের ভিতরে এমন কিছু হেরফের ঘটানো হয়েছে যার ফলে ট্রেন নিজের থেকেই মেইন লাইন থেকে লুপ লাইনের দিকে চলে যায়। শুধুই ইন্টারলকিঙের ত্রুটি হলে রেল সিগন্যাল লাল হওয়া উচিত এবং ট্রেন থেমে যেত। তাই এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার নিরপেক্ষ সুনিশ্চিত তদন্ত একান্ত দরকার যা ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। মমতা ব্যানার্জি স্বভাবজাত ভঙ্গিতে নেগেটিভ মন্তব্য করেছেন দুর্ঘটনা স্থল থেকেই। মৃতের সংখ্যা থেকে তদন্ত প্রক্রিয়া কিছুতেই তাঁর আস্থা নেই। উনি মনে করতে পারছেন না যে জ্ঞানেশ্বরী ঘটনার তদন্তের দায়িত্বও সিবিআই-কে দেওয়া হয়েছিল। এখনও সমাধান হয়নি তার। কিন্তু এটা মনে করতেই হবে সেই নাশকতায় জড়িত ছত্রধর মাহাত ১০ বছর পর জামিন পেতেই হয়ে গেলেন তৃণমূলের সম্পদ। এক লাফে নাম পৌঁছাল রাজ্যকমিটিতে। ছত্রধরের মুখে গণতন্ত্রের কথাও শোনা গেছে। সেদিন অর্থাৎ ২০১০-এর ২৮ মে যখন জ্ঞানেশ্বরীর ওপর নাশকতা হলো তখনও তো মমতাই ছিলেন রেলমন্ত্রী। তবে তিনি কেন সেদিন পদত্যাগ করলেন না?

রেল দুর্ঘটনার পর পদত্যাগ কোনো সমাধান নয়। বরং কিছুটা পলাতকের মতো দেখায়। জ্ঞানেশ্বরী কাণ্ডের দায়িত্ব সেদিনও মমতা ব্যানার্জিই সিবিআই-কে দেন। সিবিআই জ্ঞানেশ্বরী কাণ্ডের তদন্ত প্রক্রিয়া সমাপ্ত করতে না পারায় মহামান্য হাইকোর্ট তিরস্কারও করেছেন। কিন্তু সিবিআই-এর ওপর আস্থা হারানোর স্বপক্ষে মন্তব্য করেননি। তাছাড়া, বিরোধীরাই বলুন না কোন সংস্থার হাতে তদন্ত ভার দিলে তারা খুশি, তারা আস্থা রাখতে পারবেন। মমতা ব্যানার্জি সিবিআই-তে বিরক্ত। তবে কি রাজ্যের সিভিক ভলানটিয়ার দিয়ে তদন্ত করাতে চাইছেন তিনি? না চাইতেও এই মর্মান্তিক ঘটনাতে রাজনৈতিক ছোঁয়া চলে আসছে। কংগ্রেসের মল্লিকার্জুন খারগে যা লিখলেন তাতে একটা শব্দের প্রতি তীব্র আপত্তি জানাই। নরেন্দ্র মোদীর প্রতি চার পাতার চিঠিতে তিনি উল্লেখ করছেন 'The CBI or any other law enforcement agency, cannot fix accountability for technical, institutional and political failures...'

পলিটিকাল ফেইলিওর বলতে তিনি এক্ষেত্রে কী বলতে চাইছেন তা পরিষ্কার নয়। রাজনৈতিক আকার ব্যতীত আর কি কোনো আকৃতিই কংগ্রেস দেখতে পায় না? রাজনৈতিক ভাবে ওরা ট্রেনে অগ্নি সংযোগ করে নিরীহ করসেবকদের হত্যা করেছিল। ভুলে গেছে সে ইতিহাস! ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০২-এর সবরমতী এক্সপ্রেসের এস ৬ কামরায় অগ্নিসংযোগে ৫৮ জন করসেবক

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলছেন ছত্রধর মাহাত।

হত্যার পরিকল্পনার গুরু ছিলেন কংগ্রেস কাউন্সিলর হাজি বিলানি। তাই কংগ্রেসের প্রবণতাই সব বিষয়ের রাজনীতিকরণ এবং বিষয়ের মোড় পরিবর্তন। করমণ্ডল দুর্ঘটনার পর আমরা সবাই শোকস্তব্ধ। যতক্ষণ না তদন্ত প্রক্রিয়া শেষ হচ্ছে ততক্ষণ কে দায়ী তা কারোরই বলার কথা নয়। আলগা মন্তব্য, রাজনৈতিক কাদা ছোঁড়াছুড়ি মানুষের মনে আরও বেশি নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এই মর্মান্তিক ঘটনার পর একটা ন্যারেটিভ তৈরির প্রক্রিয়া চলছে যেখানে প্রচার চলছে ভারতীয় রেল অপদার্থ। তারা যাত্রী সুরক্ষা দিতে পারছে না।

নরেন্দ্র মোদীর আমল রেলের কিছুই উন্নতি ঘটায়নি। কিন্তু সত্যি এই যে, ২০১৪-তে যখন মোট ট্রেন দুর্ঘটনার সংখ্যা ছিল ১৩৫ তা পরের বছর হয় ১০৭ এবং ২০১৭-তে ১০৪, অথচ ইউপিএ-এর আমলে গড়ে বার্ষিক রেল দুর্ঘটনা ছিল ২০৭টি এবং নিহতের সংখ্যা ছিল ৭৫৯ জন। যা ইউপিএ দুইতে দুর্ঘটনার গড় হিসেবে হ্রাস পেয়ে হলো ১৩৫টি এবং মোট হতাহতের সংখ্যা ছিল ৯৩৮ জন। এই জমানায় যেখানে গড় বার্ষিক দুর্ঘটনার হার ১১৫টি এবং মোট হতাহতের সংখ্যা ৬৫২ যা পূর্ণ সাফল্য না হলেও উন্নতির দিকে যে অনেক ধাপ অগ্রসর তা নিয়ে সংশয় নেই। উল্লেখ করতেই হচ্ছে এক গুরুত্বপূর্ণ রেল সূচকের— 'অ্যাকসিডেন্ট পার মিলিয়ন ট্রেন কিলোমিটারস্'। যা যাত্রী নিরাপত্তার এক উল্লেখযোগ্য প্যারামিটার। যা ২০০৬-০৭-এ ছিল ০.২৩ এবং ২০১৫-১৬-তে হলো ০.১০ এবং যাত্রী সুরক্ষার হার আরও একটু বৃদ্ধি ঘটিয়ে ২০১৬-১৭-তে যা দাঁড়াল ০.০৯। হবে নাই-বা কেন? ইউপিএ দুই যেখানে যাত্রী সুরক্ষার খাতে বার্ষিক ৩৩, ৯৭২ কোটি টাকা ব্যয় করত। তা এনডিএ— আমলে বৃদ্ধি পেয়ে হলো ৫৪,০৩১ কোটি!

অর্থাৎ কেবলমাত্র যাত্রী সুরক্ষাতেই ৬০ শতাংশ বরাদ্দ বৃদ্ধি। বিরোধীরা সরব হচ্ছে কেন কোচগুলি LHB (linke Hofmann Busch) প্রকৃতির ছিল না। যে অত্যাধুনিক কোচ দুর্ঘটনায় অধিক সুরক্ষা দেয়। ভারতীয় রেলের ১০০ শতাংশ যাত্রীবাহী ট্রেন এখনও LHB হয়ে ওঠেনি। উন্নতি বিষয়টাই ক্রমশ ঘটে। ধাপে ধাপে চলে যে নিরন্তর প্রক্রিয়া। এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে সর্বভারতীয় স্তরের সংবাদ শিরোনাম ছিল Strides of growth! Indian Railways marks record production of LHB coach, locomotives in FY 2022-23 জানুয়ারি ৩১, ২০২৩ পর্যন্ত মোট উৎপাদন ছিল ৪,১৭৫ LHB কোচ। যা ২০২১-২২-এর তুলনাতেও ৪৫ শতাংশ অধিক।

উন্নতির জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা অব্যাহত ভারতীয় রেলের। আধুনিকতার ছোঁয়া প্রযুক্তির মোড়কে ছুটছে গাড়ি। করমণ্ডল দুর্ঘটনা নিশ্চিত ভাবে রেল লাইনে আরও অনেক বেশি সতর্কতার বার্তা দিল। দুর্ঘটনা পীড়িত মানুষের পাশে বিনিদ্র ভাবে থেকেছে রেল এবং ওড়িশা সরকার। তাই উদ্ধার কার্য সম্পন্ন হতেই আবার চলেছে করমণ্ডল। দুর্ঘটনার দৃশ্য সবাই দেখেছি। যন্ত্রণার ছবি যেন দুঃস্বপ্নের চেয়েও কঠিন। নিষ্ঠুর। এই পরস্থিতিতে যেমন সবার তৎপরতা এবং একযোগে সংবেদনশীলতার প্রয়োজন ছিল— তা দিতে পারেনি অনেক বিরোধী রাজনৈতিক দল। তারা সংবাদমাধ্যমে মোদীর নিন্দা করেছে। কিন্তু ঘটনাস্থলে যাননি। বা সাহায্যের হাত বাড়াননি। তারা প্রশ্ন তুলছেন এই পরিকাঠামোয় কোন আক্কেলে চলবে বন্দে ভারত! তবু সহযোগিতার বার্তা প্রশস্ত করেননি। এই দুর্ঘটনা এতটাই মর্মান্তিক যে মন ক্লান্ত হয়ে যায়। এর তদন্ত হোক, উত্তর উঠে আসুক। ভারতীয় রেলের গতিকে কোনো প্রতিবন্ধকতা হ্রাস করতে পারবে না।

আমরা রেলমন্ত্রীর পদত্যাগ চাই!

মণীন্দ্রনাথ সাহা

আমরা ভারতের বর্তমান রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব মহাশয়ের পদত্যাগ চাই। ভারতের অন্য কোনো রাজ্যের কেউ যেখানে রেলমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করার ধৃষ্টতা দেখায়নি, সেখানে একমাত্র আমরা, হ্যাঁ, আমরা বঙ্গবাসী বীর বিক্রমে রেলমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করছি। কেন রেলমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করছি তা নীচে লিপিবদ্ধ করলাম।

সকলেই জানেন যে, ২ জুন সন্ধ্যায় ভয়াবহ দুর্ঘটনার করলে পড়েছে হাওড়া-চেন্নাই করমণ্ডল এক্সপ্রেস। মৃত্যু হয়েছে প্রায় ৩০০ জনের, আহত হয়েছেন হাজারের কাছাকাছি। দুর্ঘটনার স্থান ওড়িশার বালেশ্বরের বাহানগা বাজার রেলস্টেশনে। দুর্ঘটনায় একসঙ্গে জড়িয়ে গেছে তিনটি ট্রেন— দুটি পরস্পর বিপরীতমুখী এক্সপ্রেস ট্রেন এবং একটি মালগাড়ি। জানা গিয়েছে তিনটি ট্রেন তিনটি লাইনে ছিল, তবুও কী করে এতবড়ো, দুর্ঘটনা ঘটল তা তদন্তে অবশ্যই প্রকাশ পাবে।

দুর্ঘটনার খবর শুনে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব পরদিন সকালে দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি বলেন, 'ভয়াবহ দুর্ঘটনা। রেল, এনডিআরএফ, এসডি আরএফ এবং ওড়িশা সরকার একযোগে উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে। সমস্ত রকম স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের চেষ্টা করা হচ্ছে। এই ঘটনা তদন্তের জন্য একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটিও গঠন করা হয়েছে। তবে সবার আগে যাত্রীদের উদ্ধারকাজের উপর সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। আর সবার কাছে আবেদন, এই কঠিন পরিস্থিতিতে বিষয়টি নিয়ে রাজনীতি করবেন না।' তিনি আরও বলেছেন, 'কীভাবে লাইনচ্যুত হলো ট্রেনটি তা জানতে উচ্চপর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে গোড়ার কারণটা জানা জরুরি।' পাশাপাশি রেল দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারের সদস্যদের ১০ লক্ষ, গুরুতর আহতদের ২ লক্ষ এবং অপেক্ষাকৃত কম আহতদের জন্য ৫০ হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন রেলমন্ত্রী।

কিন্তু রেলমন্ত্রী রাজনীতি করবেন না বললেই হলো? একে রেলদপ্তর কেন্দ্র সরকারের অধীন, আর কেন্দ্রে শাসন ক্ষমতায় রয়েছে বিজেপি দল। উপরন্তু প্রধানমন্ত্রী যেহেতু নরেন্দ্র মোদী সেহেতু রাজনীতি হবে না এটা কী করে সম্ভব? তাই আমরা অর্থাৎ আমাদের প্রতিনিধি মারফত যা বলার বলে দিয়েছি। আমাদের প্রতিনিধি হেলিকপ্টারে বালেশ্বর গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি দুর্ঘটনাস্থল ঘুরে দেখে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের সামনে বলে দিয়েছেন, 'রেলের সমন্বয়ের অভাব রয়েছে বলে মনে হচ্ছে। আরও যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন। ঘটনার সঠিক তদন্ত করা হোক। দেখা হলে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেও কথা বলব।'

এটাতো আমাদের প্রতিনিধি বলেছেন। এবার আমরা আম বাঙ্গালি আপনাকে কিছু উপদেশ দিতে চাই। আমাদের উপদেশ কান পেতে শুনে নিন। এ কেমন রেলমন্ত্রী আপনি? আপনি এই দেশের একজন ক্যাবিনেট মিনিস্টার এটা বিশ্বাস করা খুবই কঠিন আমাদের কাছে। রেল দুর্ঘটনার পর কোথায় আপনি আমাদের প্রতিনিধির মতো হেলিকপ্টারে যাবেন বালেশ্বর, কয়েকজন আমলা-গামলা আর রেল কর্তাকে পাবলিকের সামনে কষে বকুনি দেবেন আর সাসপেন্ড করবেন, তা নয়! কোথায় আপনি এক দু'ঘণ্টা ঘটনাস্থলে থেকে মিডিয়ার

সামনে সুন্দর করে বাইট দেবেন, বিরোধী দলের চক্রান্তের কথা বলবেন রাজনীতির খুঁটি সাজিয়ে। সেসব পরিচিত ছকে না গিয়ে দিনরাত বসে থাকলেন রেলের কর্তা, কর্মীদের সঙ্গে; উদ্ধারকাজ দেখলেন ব্যথিত হৃদয়ে। কারও বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করলেন না বা কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি করলেন না।

কী যে বলব আপনাকে--- ঈর্ষণীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা আর কেরিয়ার আপনার, আপনি আইআইটি কানপুরের ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড টেলি কমিউনিকেশনের মেধাবী ছাত্র। ১৯৯৪-এর ব্যাচের আইএএস ক্যাডার, সর্বভারতীয় র‍্যাংক-২৭। বিদেশি বহুজাতিকের উচ্চপদস্থ আধিকারিক হওয়া সত্ত্বেও সমস্ত কিছু ছেড়ে কেন মোদীজীর ভাবধারা, মোদীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশসেবা করতে এসেছেন, সাধারণ মানুষের সেবা করতে এসেছেন— সাধারণ মানুষ হয়েই?

অথচ দেখুন, আমাদের পাঠানো প্রতিনিধি হেলিকপ্টারে উড়ে গিয়ে আপনাকে কেমন সুন্দর জ্ঞান দিয়ে এলেন; আর আপনিও তাঁর জ্ঞান মাথা নীচু করে শুনে গেলেন। যদিও তিনি ইসলামিক ইতিহাসে এমএ পাশ আর ভুয়ো একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি ডিগ্রিধারী তবুও, তবুও...। তবে আমাদের প্রতিনিধি যখন রেলমন্ত্রী ছিলেন তখন তাঁর আমলে ঘটেছিল উত্তরবঙ্গে গাইসাল রেল দুর্ঘটনা এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেসে নজিরবিহীন ভয়ংকর মাওবাদী নাশকতা। আরও মজার, সেই ঘটনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত মাওবাদী ছত্রধর মাহাত আবার আমাদের বিদ্যাধরী প্রাক্তন রেলমন্ত্রীর জঙ্গলমহলের বহু যুদ্ধের বিশ্বস্ত সঙ্গী! আমাদের সেই দুর্বিনীত প্রতিনিধি কিন্তু সেদিন রেলমন্ত্রীর পদ না ছাড়লেও রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব, আপনাকে কিন্তু রেলমন্ত্রীর পদ ছাড়তেই হবে। কারণ আপনি আপনার পূর্ববর্তী রেলমন্ত্রীদের থেকে রাজনীতির ছক শিখতে পারেননি এখনও। সকাল ৫টা থেকে একটানা ৫১ ঘণ্টা ঠায় পড়ে থেকেছেন দুর্ঘটনাস্থলে। খাওয়া, ঘুম ভুলে এই প্রখর রোদে। এর আগে কত রেলদুর্ঘটনা ঘটেছে, রেলমন্ত্রীরা দুর্ঘটনাস্থলে এসেছেন--- গেছেন, এইভাবে একটানা কেউ থেকেছেন? ৫১ ঘণ্টার মধ্যে দুর্ঘটনাগ্রস্ত রেললাইনকে আবার স্বাভাবিক করে তুলে প্রথমে সেই রেললাইন দিয়ে মালগাড়ি চালিয়ে পরে প্যাসেঞ্জার ট্রেন চালিয়ে আপনি দেখিয়ে দিয়েছেন কীভাবে দুর্ঘটনাস্থলের কাজ তৎপরতার সঙ্গে স্বাভাবিক করে তুলতে হয়। সারা বিশ্ব আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এ বড়ো অন্যায় কাজ হয়েছে আপনার।

ফঃ ৪

আপনার আচরণ 'মন্ত্রীসুলভ' নয় একেবারেই। কাজে যাই করুন না কেন, মুখে অবশ্যই সততার প্রতীক বলতে হবে। সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে মিথ্যা বলতে হবে, নির্লজ্জভাবে ভণ্ডামি করতে হবে রাজনীতির দাবার বোর্ডে। দেশের স্বাধীনতার আগে থেকেই তো আমরা এই দেখেই এসেছি বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা এবং বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রীদের মধ্যে। গান্ধী, জিন্না, সুরাবর্দি হয়ে নেহরু জমানার নির্দশন, সেই সত্তর বছরের কংগ্রেসি শাসনতন্ত্রের চেনা পরিচিত ছক, সেই ট্র্যাডিশন। তেতো বড়ি গিলতে গিলতে আমাদের মুখ আর জিহ্বা এমন পরিবর্তন হয়ে গেছে যে এখন কেশর ভোগ খেতেও তিতা, কষা লাগে। তাই আপনার মতো কর্মপটু এবং কর্মে সাফল্যের পর কর্মকে ভক্তিভরে প্রণাম করা রেলমন্ত্রীকে আমরা চাই না। আপনি পদত্যাগ করুন অশ্বিনী বৈষ্ণব— আপনি পদত্যাগ করুন। আপনার কর্মতৎপরতার প্রশংসা সবাই করলেও আমরা আপনার পদত্যাগ চাই। মনে রাখবেন, আপনি মোদী সরকারের রেলমন্ত্রী।

এখানে একটা সন্দেহ সকলের মনেই ঘুরছে। প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট থেকে উঠে এসেছে যে এই ট্রেন দুর্ঘটনা নিছক দুর্ঘটনা নয়, এটি পরিকল্পিত এবং দু'জন মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত। তারা কারা? না, এখনও তাদের নাম, পরিচয় জানা যায়নি। তবে রেল দপ্তর জানিয়ে দিয়েছে যারা দোষী সাব্যস্ত হবে তাদের কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে।

তৃণমূলনেত্রীর জেদে পরিকল্পনার একশো বছর পরেও অসম্পূর্ণ ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো

হীরক কর

পূর্ব-পশ্চিমে ভাগীরথী নদীর তলা দিয়ে মেট্রো রেল এখনও অধরা। চলতি বছরের ১৩ এপ্রিল গঙ্গার নীচ দিয়ে মেট্রোরেলের ট্রায়াল রান হয়ে গেলেও সম্পূর্ণ ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো কবে চালু হবে কেউই জানেন না। যদিও এই দেশে এই প্রথমবার কোনো নদীর তলা দিয়ে গড়িয়েছে রেলের চাকা। কিন্তু পরিকল্পনার ১০০ বছর পেরিয়ে গেল হাওড়া ময়দান থেকে মেট্রো সল্টলেক সেক্টর ফাইভ অবধি ছুটে যেতে। আর এই বিলম্বের জন্য বিশেষজ্ঞরা দায়ী করছেন তৃণমূল নেত্রীকেই।

১৯১৯ সালে ব্রিটিশদের ইম্পেরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের বৈঠক হয়েছিল সিমলায়। ওই বৈঠকেই প্রথম কলকাতা শহরে পাতাল রেল চালানোর কথা উঠে আসে। সেই মতো ওয়াল্টার ইয়াভিং স্কাম-এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়। ওই কমিটি পূর্ব কলকাতার বাগমারী এবং হাওড়া শহরের সালকিয়া অবধি পাতালে রেললাইন পাতার প্রস্তাব দেয়। ওই প্রস্তাবেই হুগলি নদীর তলা দিয়ে রেল চলাচলের 'স্বপ্ন' ছিল।

এর ঠিক তিন বছর পরে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ার উইলিয়াম ভ্যালরিম্পল হে পুনরায় ব্রিটিশ সরকারকে কলকাতার পূর্ব পশ্চিমে লন্ডনের ধাঁচে টিউব রেল চালানোর প্রস্তাব দেন। ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ের সঙ্গে ইস্টবেঙ্গল রেলওয়েকে যুক্ত করার কথা বলেন তিনি। বাগমারী থেকে সালকিয়ার বেনারস রোড অবধি এই পাতাল রেল যাত্রার জন্য সর্বোচ্চ ভাড়া নির্ধারিত হয় তিন আনা। উইলিয়াম সাহেবের প্রস্তাবিত স্টেশনগুলো ছিল বাগমারী, নারকেলডাঙ্গা, শিয়ালদহ, আমহার্স্টস্ট্রিট, সেন্ট্রাল এভিনিউ, ডালহৌসি স্কোয়ার, ক্যানিং স্ট্রিট, হাওড়া স্টেশন, রোজমেরি লেন এবং শেষে বেনারস রোড। কথা মতো উইলিয়াম প্রকল্পের বিশদ নকশা বা ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করে ফেলেন। কিন্তু ১৯২৩ সালে ব্রিটিশ সরকার এই প্রকল্পটি অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করে দেয়। তাদের যুক্তি ছিল, এই মাপের একটি প্রকল্পকে বাস্তব রূপ দিতে গেলে স্থানীয় সরকারকে খরচের সিংহভাগ বহন করতে হবে। তৎকালীন গর্ভমেন্ট অব বেঙ্গলের সেই ক্ষমতা ছিল না। মূলত বেঙ্গল সরকারের অক্ষমতার জন্যই ব্রিটিশদের করা ইস্ট ওয়েন্ট মেট্রো প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়নি।

ফের কলকাতায় টিউবরেল তৈরির পরিকল্পনা শুরু হয় ভারত স্বাধীন হওয়ার পর। ১৯৪৯ সাল নাগাদ তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিধান চন্দ্র রায় ফরাসি প্রযুক্তিবিদদের দিয়ে কলকাতা মেট্রো সম্পর্কিত একটি সমীক্ষা করান। তাঁর মত ছিল দিল্লি-মুম্বাই-চেন্নাই- সহ দেশের অন্যান্য মেট্রো রেলের মতো গণপরিবহণে জোর দেওয়া ছাড়া কলকাতার যানজট থেকে মুক্তির উপায় নেই। সেইমতো, ১৯৬৯ সাল নাগাদ সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রযুক্তিবিদ লেনমেট্রো প্রয়েক্ট এবং জার্মান প্রযুক্তিবিদদের নিয়ে কলকাতার মেট্রোপলিটন ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট রচিত হয়। সংক্ষেপে যা এমপিটি। এমপিটি বছর খানেকের মধ্যেই রিপোর্ট পেশ করে। পাঁচটি লাইনের মোট প্রস্তাবিত দৈর্ঘ্য ছিল ৯৭.৫ কিলোমিটার। ১৯৭১ সালে পাঁচটির মধ্যে তিনটি লাইনের অনুমোদন দেওয়া হয়। লাইন তিনটি হলো, দমদম-টালিগঞ্জ, বিধাননগর-রামরাজাতলা এবং ঠাকুরপুকুর-দক্ষিণেশ্বর। কলকাতা শহরের যাত্রী পরিবহণ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে সব থেকে বেশি জোর দেওয়া হয় দমদম-টালিগঞ্জ মেট্রোরেলের ওপর। এই লাইনের দৈর্ঘ্য ছিল ১৬.৪৫ কিলোমিটার। সিদ্ধান্ত হয় ১৯৯১ সালের মধ্যে তিনটি লাইনের কাজই সম্পন্ন হবে। অর্থাৎ ১৯৭১ সাল থেকে মাত্র কুড়ি বছরের মধ্যে কলকাতা পাবে তিনটে পাতাল রেল।

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নির্দেশে ১৯৭২ সালের ২৯ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে কলকাতার

প্রথম মেট্রোরেলের নির্মাণ শুরু হয়। বিভিন্ন প্রযুক্তিগত বাধা কাটিয়ে ১৯৮৪ সালে চালু হয় উত্তর থেকে দক্ষিণে কলকাতার প্রথম পাতাল রেল। শুরুর দিনগুলোতে এসপ্লানেড থেকে ভবানীপুর পর্যন্ত চলে কলকাতার প্রথম মেট্রো রেল। লাইনের মোট দৈর্ঘ্য ছিল ৩.৪০ কিলোমিটার। কথামতো দমদম থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত পুরোপুরি ভাবে মেট্রোরেল চালু হয়ে যায় ১৯৯৫ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর।

উত্তর-দক্ষিণে ট্রানজিট রুট সম্পূর্ণরূপে চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ব-পশ্চিমে মেট্রো চালু করার দিকে নজর দেওয়া হয়। ১৯৭১ সালের মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী ইস্ট-ওয়েস্ট এবং নর্থ-সাউথ ট্রানজিট রুট মেশার কথা উত্তর-দক্ষিণ মেট্রোর সেন্ট্রাল স্টেশনে। সেই কারণেই ওই স্টেশনের নাম হয় সেন্ট্রাল। পরিকল্পনার মতো একমাত্র সেন্ট্রাল স্টেশনে নির্মাণ কাজের পর ভূগর্ভস্থ চোখ ও আকৃতির ফাউন্ডেশন বিম সরিয়ে ফেলা হয়। ততদিনে তৃণমূল কংগ্রেসের জন্ম হয়ে গেছে। তাদের উসকানিতে সেন্ট্রাল স্টেশন লাগোয়া ব্যবসায়ীদের একাংশের আপত্তিতে ওই স্টেশনের নীচ দিয়ে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা বাতিল করতে হয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপত্তিতে রুট বদলে দুটো মেট্রো লাইন এসে মিশেছে এসপ্ল্যানেড স্টেশনে। ওই স্টেশনের নীচে ঢাকা লোহার বিমগুলো প্যানেল বোরিং মেশিন দিয়ে কাটা সম্ভব নয়। তাই নিউ অস্ট্রেলিয়ান ট্রেনিং মেথডের সাহায্যে সেই বিমগুলো কাটা হয়। এর ফলে প্রকল্পের সময়সীমা বেড়ে যায়। ফলে, স্বাভাবিকভাবেই প্রকল্পের খরচ বাড়ে কয়েকগুণ।

এদিকে উত্তর-দক্ষিণের মেট্রো সম্পূর্ণভাবে চালু হবার কয়েক বছরের মধ্যেই তার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হয়। ১৯৯৯ সাল নাগাদ টালিগঞ্জ থেকে নিউ গড়িয়া অবধি মেট্রো চালানোর পরিকল্পনা করা হয়। ২০০৯ সালে গড়িয়া এবং ২০১০ সালে নিউ গড়িয়া পর্যন্ত মেট্রোর বিস্তার ঘটে। প্রকল্পের মোট খরচ হয় ৯০৭ কোটি টাকা। রেলের প্রকল্প সত্ত্বেও ওই প্রকল্পের ৩৩ শতাংশ ব্যয়ভার বহন করে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার। দক্ষিণেশ্বর থেকে কালীঘাট হয়ে কবি সুভাষ পর্যন্ত বিস্তৃতি পেয়েছে প্রথম মেট্রো রুট। যার পোশাকি নাম 'ব্লু লাইন'। নীল লাইন ছাড়াও পূর্ব-পশ্চিম অর্থাৎ ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো পোশাকি নাম 'গ্রিন লাইন'। আর জোকা থেকে যে লাইনটি আসছে তার নাম বেগুনি লাইন।

১৯৭১ সালের মাস্টারপ্ল্যান ছাড়াও ২০০৩ সালে আরও বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংস্থাকে দিয়ে সমীক্ষার কাজ চালানো হয়। তাতে ঠিক হয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগর উন্নয়নমন্ত্রকের যৌথ উদ্যোগে এই মেট্রো লাইনের কাজ শুরু হবে। প্রকল্পে আর্থিক সাহায্য করবে জাপান ব্যাংক ফর ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন সংক্ষেপে 'জেবিআইসি'। তখনই চূড়ান্ত হয়ে যায় গঙ্গার তলা দিয়ে রেলের পাতালপথ। সরকারের লক্ষ্য ছিল কলকাতার পূর্বদিকে গড়ে ওঠা নতুন অফিসপাড়া

বিধাননগর সেক্টর ফাইভের সঙ্গে হাওড়া স্টেশনের সংযোগ সাধন। ২০০৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। প্রকল্পের মোট খরচ ধরা হয় ৪৮৭৪ কোটিরও বেশি। তখন এই প্রকল্প কাজ শুরু হয়ে যায়। সেই সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে রাস্তায় নেমে এর প্রতিবাদ করেছিলেন তৃণমূল কর্মীরা। প্রকল্পের কাজে বাধা আসতে শুরু করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী হওয়ার পর থেকেই।

২০০৯ সালের মে মাসের পরে রেলমন্ত্রকের দায়িত্বপ্রাপ্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনো ভূমিকাই ছিল না এই প্রকল্পে। এই পাতাল পথের সাফল্যের বিন্দুমাত্র কোনো কৃতিত্ব তৎকালীন রাজ্য সরকারকে দিতে না চাওয়ার মনোভাব থেকেই রেলমন্ত্রী হওয়ার পরেই ভারতীয় রেলকে ব্যবহার করে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো প্রকল্পে একাধিক সমস্যা তৈরি করা শুরু করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকল্পের নির্মাণ কাজে বাধা সৃষ্টি করে রাজ্য সরকারকে বাধ্য করা হয় তাদের হাতে থাকা প্রকল্পের শেয়ার রেলের হাতে তুলে দিতে। ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোতে তারপর থেকে রাজ্য সরকারের কোনো অংশীদারিত্ব নেই। সেই সময় হাওড়া স্টেশন এবং শিয়ালদা স্টেশন চত্বরে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো কাজ চালাতেও বাধা দেওয়া হয়েছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন রেলমন্ত্রকের পক্ষ থেকে। এর পাশাপাশি দত্তাবাদ এলাকায় সাধারণ মানুষকে খেপিয়ে তুলে এই বাধা সৃষ্টি করা শুরু করে তৃণমূল কংগ্রেস।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই পাতাল পথে সবচেয়ে বড়ো ক্ষতি করেন ২০১২-১৩ সালে। বউবাজার ও লালবাজার এলাকায় গুটিকয়েক ব্যবসায়ীর স্বার্থে তৃণমূল পরিচালিত রাজ্য সরকারের তরফে রেলকে বাধ্য করা হয় ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর নকশায় বদল আনতে। প্রকল্পের ডিপিআর তৈরি হয়ে যাওয়ার পরেও রুট বদল এক কথায় নজিরবিহীন। প্রকল্পের পুরনো নকশা অনুযায়ী কথা ছিল শিয়ালদা স্টেশন থেকে এই পাতালরেল সরাসরি পূর্ব-পশ্চিমের সেন্ট্রাল স্টেশনের নীচ দিয়ে সোজা চলে আসবে হাওড়া ব্রিজের কাছে। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইচ্ছেতে রুট বদলের ফলে এই পাতাল পথ বউবাজারের তলা দিয়ে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড হয়ে চলে এসেছে ধর্মতলার কার্জন পার্কে। কার্জন পার্ক থেকে ডালহৌসির লালদীঘির নীচ দিয়ে পাতালরেল প্রবেশ করছে গঙ্গার তলায়। এই রুট বদলের ফলে মহাকরণ স্টেশনের অবস্থান বদলে যায়। এবং প্রকল্প দৈর্ঘ্যে বৃদ্ধি পায় আরও প্রায় দুই কিলোমিটার। রুট বদলের ফলে সেন্ট্রাল স্টেশন নয়, মেট্রোরেলের দুটো লাইন এসে মিশেছে এসপ্ল্যানেড স্টেশনে।

কিন্তু শিয়ালদহ থেকে এসপ্ল্যানেড পৌঁছানোর লক্ষ্যেই বারবার নেমে আসে বিপত্তি। ট্যানেল বোরিং মেশিন বা 'টিবিএম' চণ্ডী ও উর্মিকে বেগ পেতে হয় বারবার। দুলে ওঠে বিভিন্ন পুরোনো ঘরবাড়ি। ভূগর্ভস্থ জলস্তর ওপরের দিকে থাকায় হিমশিম খান ইঞ্জিনিয়াররা। স্থানীয়দেরও গ্রাস করে আতঙ্ক।

২০১৯ সালে এসপ্ল্যানেড-শিয়ালদহ রুটে খনন কাজ চালানোর সময় ট্যানেল বোরিং মেশিন একটি অ্যাকুইফার বা ভূগর্ভস্থ প্রাকৃতিক জলভাণ্ডারে ধাক্কা মারে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জেদের ফলে রুট পরিবর্তনের জন্য ধস নামে বউবাজারে। সেই ধসের কারণে আশিটির বেশি বাড়ি সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যায়। বহু বাড়িই বসবাসের অযোগ্য হয়ে দাঁড়ায়। অনেক বাসিন্দাকে রাতারাতি হোটেলে স্থানান্তরিত করতে বাধ্য হন মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ। ধস নেমে বউবাজারের একটা অংশ মাটিতে বসে যায়। ক্ষতিগ্রস্ত হয় ৬০০-র বেশি পরিবার। ক্ষুদ্র ও মাঝারি স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা বিপাকে পড়েন। তবুও হাল ছাড়েননি বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়াররা। তাঁরা মেট্রোর একদিকের বাধা দূর করতে সক্ষম হয়েছেন। যদিও আরেক দিক এখনো দূরঅস্ত। মেট্রোর নতুন জেনারেল ম্যানেজার পি, উদয় কুমার রেড্ডির ধারণা, আগামী বছর জুন মাসের মধ্যেই বউবাজারের জট কাটিয়ে মেট্রো সেক্টর ফাইভ থেকে সরাসরি পৌঁছে যাবে হাওড়া ময়দানে— ফুলবাগান থেকে হাওড়া ময়দান, এই পুরো রুটটাই মাটির তলায়। ২০২১ সাল থেকে কেএমআরসি-র হয়ে এই কাজটি করছে অ্যাবকনস ইনফ্রাস্ট্রাকচার।

গঙ্গার তলদেশ থেকে ১৩ মিটার নীচে ৬.৮ মিটার ব্যাসের এই টানেল এখন বাঙ্গালির অহংকার। এপার-ওপারের মধ্যে ৫২০ মিটারের সুরঙ্গ হাওড়া-কলকাতা দুটি শহরের শুধু নয়, সমস্ত বাঙ্গালির আত্মবিশ্বাসের প্রতীক। ২০২০ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি মাটির উপর দিয়ে মেট্রো নেটওয়ার্ককে যুক্ত হলো সল্টলেক সেক্টর-৫ থেকে সল্টলেক স্টেডিয়াম। সেই বছরই ৪ অক্টোবর ফুলবাগান যুক্ত হলো এই সবুজ লাইনের সঙ্গে। ২০২২-এর ২৪ জুলাই প্রত্যাশা পূরণ করে ফের মাটির তলা দিয়ে মেট্রো পৌঁছে গেল শিয়ালদা স্টেশনে। ফুলবাগান থেকে হাওড়া ময়দান এই পুরো রুটটাই পাতাল পথ। ২০১৮ সালের ২৩ মার্চ টিবিএম 'প্রেমা' সফলভাবে টানেল কেটে হাওড়া ময়দান থেকে গঙ্গার নীচ দিয়ে এসপ্ল্যানেডে প্রবেশ করে। আর ওই বছরেই ৫ এপ্রিল আরেক টিবিএম 'রচনা' নির্বিঘ্নে পৌঁছে যায় হাওড়া ময়দান মেট্রে স্টেশনে। গঙ্গার তলা দিয়ে দুই প্রান্তেই শেষ হয় টানেল বোরিঙের কাজ। প্রেমার টানা টানেল গেছে হাওড়া ময়দানের দিকে। রচনা টানেল কেটে নিয়ে গেছে ধর্মতলামুখী। মাত্র ৪৫ সেকেন্ডে এই দুই কন্যা মেট্রোরেলকে পার করে দিচ্ছে গঙ্গা। ৮ হাজার কোটি টাকার এই মেট্রো প্রকল্প শুধু পশ্চিমবঙ্গের নয়, গোটা দেশেরই গৌরবের এক নতুন ফলক।

ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর রেক এসেছে বেঙ্গালুরু থেকে। বেঙ্গালুরু ভারত আর্থ মুভার্স লিমিটেডের তৈরি এই রেকও আত্মনির্ভর ভারতের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এগুলো অনেক বেশি আরামদায়ক। কিন্তু চলতি বছরের পুজোর আগে সাধারণ মানুষ সেক্টর-৫ থেকে মহাকরণ হয়ে গঙ্গার তলা দিয়ে হাওড়া স্টেশন ছুঁয়ে হাওড়া ময়দান পৌঁছে যাবেন, এমন আসার কথা মেট্রো কর্তারা বলতে পারেননি। তাঁদের আশা এ বছরই গঙ্গার নীচ দিয়ে মেট্রো চলার স্বপ্ন সত্যি হলেও হতে পারে। আর সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দান? দূর স্বপ্ন। অথচ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন এই রুট বদলের দাবি জানিয়েছিলেন, তখনই বিশেষজ্ঞরা বলেছিলেন, বউবজারের তলার মাটি ভার বহনে সক্ষম নয়। তার কারণ এই অঞ্চল দিয়েই একসময় খাঁড়ি নদী বা ক্রিক বইত। সেই নদীর একটা অংশ ভরাট করেই গড়ে উঠেছে ক্রিক রো। ফলে এই অংশের নীচ দিয়ে মেট্রো নিয়ে যাওয়া বিপর্যয়ের শামিল। সেদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কারও কোনো কথা শোনেননি। আর এর জন্যই ২০১৪ সালে ডেট লাইন থাকলেও ২০২৩ সালের মাঝামাঝি এসেও সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারল না ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো।

অথচ এইসব চূড়ান্ত বাস্তব ঘটনা সত্ত্বেও গঙ্গার তলা দিয়ে মেট্রো নিয়ে যাবার কৃতিত্ব দাবি করে বিজ্ঞাপনী প্রতিযোগিতা চলছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে। বিশেষজ্ঞ প্রযুক্তিবিদদের বিজ্ঞানসম্মত পরামর্শকে অগ্রাহ্য করে সংকীর্ণ রাজনীতিই দেরি করিয়ে দিল গঙ্গার তলা দিয়ে স্বপ্নের মেট্রো পথ। এই প্রকল্পের প্রস্তাবনা আসে ১৯১৯ সালে। ১৯২১ সালে এই প্রকল্প নির্মাণের পরিকল্পনা করে ব্রিটিশরা। অর্থাৎ পরিকল্পনার ১০৩ বছর পরেও রূপায়িত হতে পারল না ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো। তাই ২০২৩ সালে দাঁড়িয়ে প্রকারান্তরে বলাই যায় শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জেদের জন্যই ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো প্রকল্প পরিকল্পনার একশো বছর পরেও সম্পূর্ণরূপে রূপায়িত হলো না। অথচ বেড়ে গেল খরচ। সেইসঙ্গে সাধারণ মানুষের ভোগান্তিও। ■

সুপ্রচীন ভারতীয় সংস্কৃতির এক মহান পরম্পরা

শ্রীগুরুপূর্ণিমা

মন্দার গোস্বামী

গুরুপূর্ণিমা বা আষাঢ়ী পূর্ণিমা হিন্দু সমাজ জীবনে অন্যতম এক পবিত্র দিন। এই পুণ্য তিথিতেই আবির্ভূত হয়েছিলেন বেদ-বিভাজক, মহাভারত রচয়িতা মনুষ্যশ্রেষ্ঠ মহর্ষি ব্যাসদেব। গুরুশ্রেষ্ঠ বেদব্যাস যাঁকে স্বয়ং নারায়ণের সঙ্গে তুলনা করা হয়— 'ব্যাসো নারায়ণং স্বয়ং'। তিনি আমাদের জাতীয় জীবনের শ্রেষ্ঠ গুণগুলিকে একত্রিত করে মানব জীবনকে পথ দেখিয়েছেন। তাঁর এই জন্মতিথি ব্যাস পূর্ণিমা নামেও পরিচিত।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে গুরু-শিষ্য সম্পর্ক হাজার হাজার বছরের পুরনো এক আবহমান পরম্পরা। চলতি প্রবাদ, 'গুরু বিনে জ্ঞান নেই'। সুপ্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, প্রাচীন ভারতে বালকেরা গুরুকুল আশ্রমের মাধ্যমেই শিক্ষা নিয়ে জ্ঞান লাভ করত। যেখানে রাজার সন্তানের সঙ্গে প্রজার সন্তানের কোনো ভেদ ছিল না। প্রত্যেককেই কষ্টসাধ্য পরিশ্রম করে, ভিক্ষালব্ধ আহারের মাধ্যমে জীবন নির্বাহ করতে হতো। শিক্ষা সমাপ্ত হতো গুরুভক্তির কঠোর পরীক্ষার মাধ্যমে। উদাহরণ হিসেবে উপমন্যু অথবা আরুণির কথা বলা যায়।

আয়োধৌম্য ঋষির শিষ্য উপমন্যু গুরুর নির্দেশে প্রতিদিন গোরু চরাতেন। ভিক্ষাবৃত্তির মাধ্যমে তাঁর জীবন নির্বাহ হতো। শরীর স্বাস্থ্যের উন্নতি দেখে একদিন আচার্য আয়োধৌম্য তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, সে এত খাদ্য পাচ্ছে কোথা থেকে। উত্তরে তিনি তাঁর ভিক্ষাবৃত্তির কথা জানান। আচার্য তাঁকে বললেন যে, গুরুকে নিবেদন না করে ভিক্ষান্ন ভোজন অনুচিত। উপমন্যু এরপর ভিক্ষালব্ধ সমস্ত সামগ্রী গুরু চরণে অর্পণ করতেন। গুরুদেব পরীক্ষার কারণে উপমন্যুকে কিছুই দিতেন না। এরপরেও উপমন্যুকে স্বাস্থ্যবান দেখে গুরু পুনরায় তাঁর স্বাস্থ্যের শ্রীবৃদ্ধির কারণ জিজ্ঞাসা করলে উপমন্যু জানালেন যে, প্রথম ভিক্ষার সমস্ত দ্রব্যগুরুকে প্রদান করলেও দ্বিতীয়বার ভিক্ষার মাধ্যমে তিনি জীবন নির্বাহ করেন। আচার্য তাঁকে দ্বিতীয়বার ভিক্ষা করতে নিষেধ করলেন, জানালেন— এতে লোভ বৃদ্ধি পায়, পাশাপাশি অন্য ভিক্ষাজীবী ক্ষতি হয়। গুরু নির্দেশ পালন করতে এরপর উপমন্যু মাত্র একবারই ভিক্ষা করতেন এবং গুরু চরণে নিবেদন করে তা গ্রহণ করতেন।

তারপরও উপমন্যুর কোনও রূপ স্বাস্থ্যহানি না ঘটায় আশ্চর্যান্বিত আচার্য জানতে পারলেন যে, উপমন্যু আশ্রমের গোরুর দুধ খেয়ে থাকেন। গুরুদেব তাঁকে তিরস্কার করে জানালেন যে, এইভাবে আশ্রমের গোরুর দুধ খাওয়া অন্যায়। এরপরও উপমন্যুর স্বাস্থ্যের উন্নতি দেখে আচার্য পুনরায় জানতে পারলেন যে, গোরুর দুধ তাদের বাছুর খাওয়ার পর বাছুরের মুখে যে ফেনা থাকে তা খেয়েই উপমন্যু ক্ষুধা মেটান। আচার্য এবার বললেন যে, বাছুরের মুখ থেকে এভাবে দুগ্ধ সংগ্রহ কখনই উচিত নয়, কারণ এতে বাছুরদের খাদ্য গ্রহণে ব্যাঘাত ঘটে। খাদ্য গ্রহণের আর কোনও উপায় না পেয়ে উপমন্যু কিছুদিন অভুক্তই থাকলেন। একদিন আর থাকতে না পেরে ক্ষুধা যন্ত্রণায় আকন্দ পাতা চিবিয়ে খেলেন। আকন্দের পাতা অত্যন্ত বিষাক্ত। বিষের প্রভাবে উপমন্যু অন্ধ হয়ে গিয়ে একটি কুয়োর ভেতর পড়ে যান। সন্ধ্যায় গোরুগুলি ফিরে এলেও উপমন্যু না ফেরায় চিন্তিত আচার্য সদলবলে শিষ্যকে খুঁজতে বেরোলেন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর কুয়োর মধ্যে অর্ধমৃত উপমন্যুকে পাওয়া গেল। সমস্ত ঘটনা জানবার পর আচার্য দেব-চিকিৎসক অশ্বিনীকুমারদ্বয়-কে আহ্বান করলেন। তাঁরা এসে অন্ধত্ব মুক্তির জন্যে উপমন্যুকে একটি পিঠে খেতে দিলেন। কিন্তু অনাহারক্লিষ্ট উপমন্যু সেই দিব্য পিঠে গুরুকে নিবেদন না করে কোনো মতেই গ্রহণ করতে চাইলেন না। গুরু ভক্তির এমন নিদর্শন দেখে, অশ্বিনীকুমারদ্বয় অত্যন্ত প্রীত হয়ে তাঁকে বর দিলেন। উপমন্যুর অন্ধত্ব দূর হলো, তিনি সুস্বাস্থ্য ফিরে পেয়ে গুরুদেবকে ভক্তিভরে প্রণাম করলেন। গুরুভক্তিতে মুগ্ধ আচার্য জানালেন যে, সবটাই গুরুভক্তির পরীক্ষা ছিল। উপমন্যু সেই পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ। এরপর গুরু কৃপায় বেদ-সহ বিবিধ শাস্ত্র আত্মস্থ করে উপমন্যু নিজ গৃহে ফিরে গেলেন।

অয়োধৌম্যের অপর এক শিষ্য আরুণি

গুরুর নির্দেশে জমিতে বন্যার জলপ্রবেশ বন্ধ করতে, প্রবল স্রোতের বিরুদ্ধে স্বয়ং আলের মধ্যে শুয়ে পড়েছিলেন। এতে তাঁর প্রাণ সংশয় উপস্থিত হলেও গুরু ভক্তিতে অবিচল আরুণি কিছুতেই আপন কর্তব্যচ্যুত হননি। পরবর্তীকালে গুরুদেবের কাছে এই সংবাদ পৌঁছলে তিনি দ্রুত এসে আরুণির প্রাণ রক্ষা করেন এবং আরুণির গুরুভক্তিতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে আশীর্বাদ প্রদান করেন।

'গুরু' শব্দটিকে বিচ্ছিন্ন করলে পাওয়া যায় 'গু' এবং 'রু' শব্দ দুটি। 'গু' শব্দটির অর্থ অন্ধকার এবং 'রু' শব্দটির অর্থ আলো অর্থাৎ যিনি অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোর দিকে নিয়ে যান তিনিই গুরু।

একটি শিশু মাতৃগর্ভের অন্ধকার থেকে আলোকময় পৃথিবীতে এসে মায়ের মাধ্যমেই প্রথম জীবন শিক্ষা লাভ করে। তাই মা-ই আমাদের প্রথম গুরু। শাস্ত্রে বলেছে— 'অজ্ঞানং তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া, চক্ষুরুন্মীলিতং যেন, তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ। অর্থাৎ জ্ঞান-রূপী শলাকার মাধ্যমে, অজ্ঞানরূপ অন্ধকার দূর করে, যিনি জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করেন, সেই গুরুকে প্রণাম। গুরুকে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর এর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। হিন্দু ধর্মে বলা হয়েছে, 'যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ' অর্থাৎ গুরু ও দেবতার প্রতি সমান শ্রদ্ধা পোষণ করা উচিত।

এই পুণ্য পরম্পরাতেই আমরা দেখতে পাই যে, ত্রেতাযুগে ঋষি বশিষ্ঠদেব তাঁর গুরুকুলে সারস্বত সাধনায় দীক্ষিত করছেন রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্নকে। দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম শিক্ষালাভ করছেন সন্দীপনী মুনির কাছে। আবার মহর্ষি গোবিন্দপাদের কাছে দীক্ষিত হয়েছিলেন আদি শঙ্করাচার্য।

আদর্শ গুরুর অন্যতম কর্তব্য বিদ্যাদানের পাশাপাশি শিশুদের মধ্যে যাতে বিবিধ গুণাত্মক বিকাশ ঘটে, তার প্রশিক্ষণ দেওয়া। পাশাপাশি তারা যাতে ব্যক্তি থেকে সমষ্টির কল্যাণে আত্মনিয়োগ করে, সমৃদ্ধ শ্রেষ্ঠ সমাজ নির্মাণ করতে পারে, তার সংস্কার প্রদান। এই ভাবেই গুরু চাণক্যের মাধ্যমে সংস্কারিত হয়েছেন চন্দ্রগুপ্ত। যিনি অজেয় গ্রিক বাহিনীকে ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত করে এক বৃহৎ কল্যাণকারী সাম্রাজ্যের স্থাপনা করেছিলেন। আবার প্রবল প্রতাপান্বিত মুঘল বাদশা ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে লড়াই করে যে শিবাজী হিন্দুসাম্রাজ্যের পুনঃস্থাপন করেছিলেন, তার মূলেও ছিল সমর্থ গুরু রামদাসের শিক্ষা ও প্রেরণা। আধুনিককালেও আমরা দেখি যে স্বামী বিবেকানন্দকে নির্মাণ করেছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, যাঁর গুরু ছিলেন সাধক তোতাপুরি। শুধুমাত্র হিন্দু সমাজ নয়, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ সমাজ-সহ বৃহত্তর হিন্দু সংস্কৃতির নানাবিধ পন্থ, সংগঠন এই পুণ্যদিনে নিজেদের পন্থ অথবা সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের, (তিনি জীবিত অথবা মৃত হতে পারেন) কিংবা প্রেরণাদায়ী ধর্মপুস্তক (পবিত্র গুরুগ্রন্থ সাহিব)-কে গুরু জ্ঞানে পূজা করেন।

বিশ্বের বৃহত্তম স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ পরম পবিত্র গৈরিক পতাকাকেই গুরু রূপে বরণ করেছে। পরম পবিত্র গৈরিক পতাকা হাজার হাজার বছরের পুরাতন ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতির প্রতীক। ত্যাগের প্রতীক। অখণ্ড ভারতবর্ষের প্রতীক। পবিত্র হোমাগ্নির প্রতীক। পরম পবিত্র গৈরিক ধ্বজ সাংস্কৃতিক ভারতের বিবিধ ইতিহাসের সাক্ষী। এই পতাকার নীচেই যুদ্ধ হয়েছে রামায়ণের, যুদ্ধ হয়েছে মহাভারতের, যুদ্ধ হয়েছে ধর্মের সঙ্গে অধর্মের। রাণা প্রতাপ, ছত্রপতি শিবাজী এই পতাকাতলেই মুঘলদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তারজী বলেছেন, 'সঙ্ঘ কোনও ব্যক্তি বিশেষকে গুরু স্থানে না রাখিয়া পরম পবিত্র গৈরিক ধ্বজকে গুরু হিসেবে গ্রহণ করিয়াছে। ইহার কারণ ব্যক্তি যতই মহান হোক, সে কখনও পূর্ণ ও অপরিবর্তনীয় হতে পারে না। অতএব ব্যক্তি বিশেষকে গুরু হিসেবে স্বীকার না করিয়া আমরা সেই জয়িষ্ণু ও প্রভাবশালী গৈরিক ধ্বজকেই গুরু হিসেবে স্বীকার করিয়াছি। যাহার মধ্যে আমাদের ইতিহাস পরম্পরা এবং রাষ্ট্রের জন্যে স্বার্থ ত্যাগের কথা এবং রাষ্ট্রীয়ত্বের সমস্ত মূল কথার সমন্বয় হইয়াছে। এই ভগবাধ্বজ হইতে আমরা যে উৎসাহ পাই, তাহা কোনও মানুষের নিকট হইতে পাওয়া উৎসাহ অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ।'

ভারতের জাতীয় পতাকা কীরূপ হবে তা নির্ধারণের জন্য ১৯৩১ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে 'ফ্ল্যাগ কমিটি' গঠিত হয়েছিল। কমিটিতে ছিলেন জওহরলাল নেহরু, সরদার বল্লভভাই প্যাটেল, আবুল কালাম আজাদ, পট্টভি সীতারামাইয়া, মাস্টার তারা সিংহ, ডিপি কালেলকর এবং ড. এনএস হার্ডিকর। দেশ জুড়ে বহু আলোচনা এবং বিশিষ্টজনের মতো বিনিময়ের পর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয়... 'If threre is one colour that is more acceptable to the Indians as a whole even as it is more distinctive than another one is associated with this ancient country by long tradition, it is keshri or saffron colour'। অর্থাৎ 'যদি কোনও একটি রং ভারতবাসীর কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়, যা সর্বপরি ভিন্ন, স্পষ্ট এবং এদেশের প্রাচীন ঐতিহ্যর সঙ্গে পরম্পরাগত ভাবে সম্পর্কিত, তবে তা হলো গৈরিক।' সুতরাং ফ্ল্যাগ কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে ভারতের জাতীয় পতাকা হবে পূর্ণ গৈরিক এবং মধ্যে অঙ্কিত থাকবে একটি চরকা। যদিও গান্ধীজীর বিরোধিতায় এই প্রস্তাব বাস্তবায়িত হয়নি।

গুরুপূজনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হলো, গুরুদক্ষিণা। গুরুদক্ষিণা ছাড়া গুরু শিক্ষা অসম্পূর্ণ। গুরুদক্ষিণা প্রদানের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ একলব্য, যিনি বিনা বাক্যব্যয়ে নিজের শক্তিকেন্দ্র, ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যের শ্রীচরণে অর্পণ করেছিলেন। মানব জীবনে প্রকৃত গুরুদক্ষিণা হলো— 'রাষ্ট্রায় স্বাহা, ইদং রাষ্ট্রায়, ইদং ন মম' অর্থাৎ কোনো কিছুই আমার নয়, সমাজের জন্য, দেশের কল্যাণে, তন-মন-ধনের পরিপূর্ণ সমর্পণ। ভারতীয় দর্শনই হলো— 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিথা' ত্যাগের মাধ্যমেই ভোগ। সেই কোনকালে ভারতীয় ঋষিরা বলে গেছেন যে— 'জীবনে যাবদা দানং স্যাৎ প্রদানং ততোধিকং' অর্থাৎ জীবনে সমাজ থেকে যা গ্রহণ করি, তার অধিক যেন সমাজকে দিয়ে যেতে পারি। গুরুপূর্ণিমার পুণ্য তিথিতে এই আমাদের সংকল্প হোক। □

অসমের সত্র সংস্কৃতির পীঠস্থান মাজুলী

ড. পূর্ণেন্দু শেখর দাস

অসমের ব্রহ্মপুত্র নদীমাঝে অবস্থিত জনবসতি থাকা পৃথিবীর বৃহত্তম নদীদ্বীপের নাম মাজুলী। এটি অসমের যোরহাট জেলার মাজুলী মহকুমার সদরস্থান। অতীতে এই মাজুলীর মোট ভূমির পরিমাণ ছিল ১২৫৬ বর্গ কিলোমিটার। কিন্তু প্রচণ্ড ভূমিস্খলনের ফলে বর্তমানে ভূমির পরিমাপ কমে হয়েছে ৯২৯ বর্গকিলোমিটার।

বৈষ্ণবদের পবিত্র তীর্থস্থান মাজুলীতেই মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সর্বপ্রথমে ধূয়াহাটা বা বেলগুরিসত্র স্থাপন করেন। এই সত্র বর্তমান ব্রহ্মপুত্রের অতল জলাশয়ে সমাহিত। যদিও শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের আদর্শে মাজুলীর বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠেছে ছোটো বড়ো অনেক সত্র এবং এই প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমেই সত্রীয়া সংস্কৃতির পরম্পরা বজায় আছে। বেলগুরি সত্রতেই ১৫২২ খ্রিস্টাব্দে শ্রীমন্তশঙ্করদেব ও তাঁর প্রধান শিষ্য শ্রীশ্রী মাধবদেবের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। শঙ্কর-মাধবের এই মিলনকে অসমীয়া সাহিত্যে 'মণিকাঞ্চন সংযোগ' আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

অতীতে এই মাজুলীর নাম 'মাজালি' বা 'মজালি' ছিল বলেও জানা যায়। ইতিহাসবিদ নকুলচন্দ্র ভুঁইয়ার মতে আহোমরাজ স্বর্গদেও জয়ধ্বজ সিংহের রাজত্বকালে (১৬৪৮-১৬৬৩) এই মাজুলী নদীদ্বীপের আকার নেয়। স্বর্গদেও লক্ষ্মীসিংহের রাজত্বকালে (১৭৬৯-১৭৮০) বেঙেনাআটি সত্রকে দেওয়া ভূমিদান ফলকে 'মাজলি' ও 'মজালি' এই দুই শব্দই ব্যবহৃত হয়েছে। সে যাই হোক, অভিধানগত অর্থে জলের দ্বারা আবৃত দিহিং, লুইত পরিবেষ্টিত এই ভূখণ্ডই মাজুলী নামে পরিচিত হয়। পণ্ডিত অতুলচন্দ্র হাজারিকার মতে 'মাজুলী' হচ্ছে মা (লক্ষ্মী) জুলী (ভাঁড়ার) অর্থাৎ লক্ষ্মীর ভাঁড়ার বা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। একসময় শস্য-মৎস্যে ভরপুর অবস্থায় ছিল বলেও এমন নামের অবতারণা হতে পারে বলেও অনেকের ধারণা।

সত্র সংস্কৃতির পীঠস্থান মাজুলীতে আগে আনুমানিক ৬০টি সত্র ছিল বলে জানা যায়। বর্তমান অবশ্য ২২টি স্বীকৃতি প্রাপ্ত সত্র আছে। 'সত্র' হচ্ছে মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের ও শ্রীশ্রী মাধবদেবের দ্বারা অসমে নববৈষ্ণব ধর্মের প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে স্থাপন করা প্রতিষ্ঠান। 'সত্র' শব্দটির অভিধানগত অর্থ হচ্ছে— অধিবেশন, হোম, যজ্ঞানুষ্ঠান, নিবাসস্থান। 'সত্র' শব্দটির অন্য এক অর্থ হলো ধর্ম, শরণ বা দীক্ষা ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রদান করা।

ইষ্ট দেবতাকে উপাসনা করা, ধর্মীয় তত্ত্ব চর্চা করা এবং তার প্রচার ও প্রসার ঘটানোই সত্র ও সত্রীয় সংস্কৃতির প্রধান লক্ষ্য। অসমীয়া সংস্কৃতির ধারক বরগীত, সত্রীয়া নৃত্য, চালি নৃত্য, ঝুমুরা নৃত্য, দশাবতার নৃত্য ইত্যাদির সঙ্গে পুরাতন ধর্মগ্রন্থ ও অন্যান্য রকমের ইতিহাসের ধারক বাহক সামগ্রী সমুহের রক্ষণাবেক্ষণের ভাণ্ডার হচ্ছে এই সত্রসমুহ।

মাজুলীতে অবস্থিত স্বীকৃতি প্রাপ্ত সত্রসমূহ হচ্ছে— আউনীআটী, গড়মূর, দক্ষিণপাট, বেঙেনাআটি, নতুন কমলাবাড়ি, উত্তর কমলাবাড়ি, ভোগপুর, নতুন চামগুড়ি, বিহিমপুর, আদি বিহিমপুর, নরসিংহ এলেঙী, বড় এলেঙী, মলুয়াল বড় এলেঙী, আদি এলেঙী, সাঁকোপাড়া, ঔয়া, বেলে সিন্ধীয়া, গড়মূর ছোটো সত্র, মধ্য কমলাবাড়ি, আধার সত্র এবং বালিচাপরি বড়ো এলেঙী সত্র।

মাজুলী অসমের সত্রীয়া সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। লোককলা, ভক্তিসহযোগে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন উৎসব-পার্বণ ছাড়াও মাজুলীতে রাসমহোৎসব ও নাটপ্রধান 'ভাঙনা' সমূহ এক বিশেষ মাত্রায় বর্ণাঢ্য রূপ পেয়েছে। নৃত্য, অভিনয়ে সমৃদ্ধ রামমহোৎসব মাজুলীকে বিশেষ ভাবে মহিমান্বিত করেছে। মাজুলীর সত্রসমূহেতে নিয়মিত চর্চা হয়— বরগীত, সত্রীয়া নৃত্য, দশাবতার নৃত্য, অঙ্কর নৃত্য, সূত্রধার, ওজাপালি, ঝুমুরা নৃত্য, চালি নৃত্য, যাত্রাপালা ইত্যাদি। এইসবের মাধ্যমে মাজুলীকে বৈষ্ণব সংস্কৃতির সঙ্গে সামগ্রিকভাবে বৃহত্তর অসমীয়া কলা- সংস্কৃতিরও পীঠস্থান হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। প্রাচীন ঐতিহ্য ও সম্পদের জীবন্ত আর্কাইভ রূপেও মাজুলীর নাম সততই উচ্চারিত হয়ে থাকে। মৃৎশিল্প, সাঁচিপাতার পুঁথি, প্রাচীন অলংকারাদি, কাঠের মূর্তি, সিংহাসন, শরাই আদি হস্তশিল্প ও চারুশিল্পের চর্চাও প্রসঙ্গত উল্লেখ্য। মাজুলীর মুখোশ শিল্প বিশেষ ভাবে মহিমামণ্ডিত। অতীত বিভিন্ন সত্রেতেই এই শিল্পকাজের চর্চা ছিল যদিও বর্তমানে কেবলমাত্র চামগুড়ি সত্রেতেই এই শিল্পকাজের চর্চা ছিল, যদিও বর্তমান কেবলমাত্র চামগুড়ি সত্রেতেই এই শিল্পকাজের চর্চা দেখতে পাওয়া যায়। ভারতের পুরাতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগের দ্বারা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র শ্রেণীর (Cultural Landscape) অধীনে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্রের তালিকাতে অন্তর্ভুক্ত করতে এই মাজুলীকে মনোনিত করা হয়েছে। □

ফলিত জ্যোতিষের মাহাত্ম্য

অচিন্ত্যরতন দেবতীর্থ

অর্থশাস্ত্র ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মতো একটি বিশেষ বিজ্ঞান হলো ফলিত জ্যোতিষ। কিন্তু কম্পিউটার, গণিত, পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্রের মতো প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান নয়। আনুমানিক ৩০০০ বছর আগে জ্যোতিষশাস্ত্রের সৃষ্টি হয়েছে। জ্যোতিষ- শাস্ত্রের (জ্যোতিঃশাস্ত্রের) প্রবর্তক আঠারো জন মহর্ষি হলেন— ব্রহ্মা, সূর্য মনু, কশ্যপ, বশিষ্ঠ, অত্রি, মরীচি, ভৃগু, পরাশর, ব্যাস, গর্গ, অঙ্গিরা, রোমক, পৌলিশ, চ্যাবন, শৌনক, যবনাচার্য (যোমুনাচার্য) ও দেবর্ষি নারদ। ব্রহ্মার মানসপুত্র আঠারো জন মহর্ষির মধ্যে, ঋষি পরাশর (ঔর্ব) সংহিতায় কথিত আছে, 'পূর্ব জন্মার্জিতং কর্মং শুভাশুভ ফলপ্রদম্/পুণ্য পাপ সমুদ্ভূতং গ্রহরূপেণ সংস্থিতং।' অর্থাৎ পূর্বজন্মের পুণ্য ও পাপ বর্তমান জন্মে গ্রহরূপে রাশিচক্র সংস্থিত হয়েছে। গ্রহগণ স্বাধীন নন। তাঁরা কর্মফলরূপী ঈশ্বর জীবাত্মা তথা আদ্যাশক্তির অধীন। মানুষকে তার ভবিষ্যতের নির্দেশ দেবার জন্য যাতে সে নিজের ভাগ্যের অবস্থা বুঝতে পারে এবং সঠিক পথে চলতে পারে। সেইজন্য ফলিত জ্যোতিষের সৃষ্টি।

জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ বাদ দিলে ফলিত জ্যোতিষের ফলাফল শতকরা আশি ভাগ মেলে। এই ফলিত জ্যোতিষ দ্বারা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায়, বোঝা যায়, সেইমতো ব্যবস্থা নেওয়া যায়। অর্থাৎ নিজেকে জানবার, শোধরাবার ও প্রতিষ্ঠিত হবার একমাত্র উপায়। ইষ্টলাভ না হলে জ্যোতিষশাস্ত্রের সত্য উপলব্ধি হয় না। শ্রীমা সারদাদেবী বলেছেন, 'যার নেই ইষ্ট তার সবই অনিষ্ট, যোগ-জ্যোতিষ- বৈদ্য ইষ্ট বিনা ভ্রষ্ট।' স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি ছাড়া সব মানুষের ভবিষ্যৎ জানা প্রয়োজন। ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্রের আসল উদ্দেশ্য হলো পরাবিদ্যা, যাকে ব্রহ্মবিদ্যা বলা হয়ে থাকে, সেই মধুবিদ্যায় পৌঁছন অর্থাৎ শ্রেয়োলাভ করা। ফলিত জ্যোতিষ একটি বেদাঙ্গ। ষড়্দর্শন ও বেদাঙ্গের উদ্দেশ্যই হলো শ্রেয়োলাভের পথ প্রদর্শন করা। বেদের অন্যান্য অঙ্গ অপেক্ষা জ্যোতিষশাস্ত্রেরই প্রাধান্য বেশি। কারণ ফলিত জ্যোতিষ প্রত্যক্ষ শাস্ত্র। জ্যোতিষ বেদের চক্ষু স্বরূপ এবং ভবিষ্যতের প্রকাশক।

দেবর্ষি নারদ ও মহর্ষি গর্গ বলেছেন, জ্যোতিষের সাহায্য ব্যতীত মানব অন্ধবৎ— তার জীবন অন্ধকারময়। বৈদিক যুগে ভারতীয় ঋষিগণ বলেছেন--- ফলিত জ্যোতিষ অদৃষ্টবাদ, মনুষ্য জীবনে ভবিষ্যতের আভাস পাওয়া যায় মাত্র। পরশরাচার্য বলেছেন, চরপর্যায়ে দশার জ্ঞান হলে উত্তম দৈবজ্ঞ হওয়া যায়— সর্ববেত্তা হতে পারে। যতক্ষণ মানুষ প্রকৃতির অধীন ততক্ষণ পর্যন্ত কালরূপী প্রকাশমান জ্যোতিষশাস্ত্রের অধীন। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, অতীত জীবনের চিন্তা ও কর্মরাশি ফল আমাদের এই জীবন।

এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক বলেছেন, মনুষ্য জীবনের সাফল্য বা ব্যর্থতার রহস্য লুকিয়ে রয়েছে তার জিনে। গৌতমবুদ্ধ বলেছেন, 'আমরা এখন যা, তা হলো আমাদের চিন্তার ফল। চিন্তাই আমাদের জীবনের রূপকার'। যিশুখ্রিস্ট বলেছেন, 'মানুষ যেরকম বীজ বুনবে, সেরকম ফল পাবে।' বৈজ্ঞানিক নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্রে বলা হয়েছে যে, 'প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া হয়'। আমেরিকার বিখ্যাত অতীন্দ্রিয়বাদী মনস্তত্ত্ববিদ এডগার কেইসি বলেছেন, 'যে জীবন আজকের ফল হিসেবে পাওয়া যাচ্ছে তা বহুদিন আগেকার অভিজ্ঞতার পরিণতি। জীবন হলো একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, এর মধ্যে কর্ম হলো মনোবৈজ্ঞানিক নিয়ম এবং প্রাথমিকভাবে এটি মনোজগতেই কাজ করে। ভৌত অবস্থা হলো উপায় মাত্র, যার মধ্য দিয়ে মনোজগতের উদ্দেশ্য সাধিত হয়।' নিজে ভালো না হলে অপরে ভালো করে দিতে পারে না। মধুবিদ্যায় প্রতিকার হয়। তখন জীবজগৎ মধুময় হয়। মধুবিদ্যা হচ্ছে ব্রহ্মবিদ্যা। চাই অতীন্দ্রিয় অনুভূতি Extra sensory Pereception (E.S.P.) জীবাত্মার জ্ঞান। তার প্রমাণ দস্যুরত্নাকর পরবর্তীকালে মহর্ষি বাল্মীকি নামে বিশ্বের প্রথম কবি। রামায়ণ তাঁর প্রথম মহাকাব্য। ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি বেদব্যাস মহাত্মা যুধিষ্ঠিকে বলেছেন--- দৈবকৃপা সময় না হলে হয় না। দৈবের চেয়ে মহাবল আর কিছুই নেই। যোগ-জ্যোতিষ-তন্ত্র- চিকিৎসা প্রত্যক্ষ শাস্ত্র। অন্যান্য বিনোদন শাস্ত্র মাত্র (দ্রষ্টব্য-কুলার্ণব তন্ত্র)।

শাস্ত্রে ব্রহ্মা বলেছেন, 'নিষেকঃ কেন বার্য্যতে'— (১/৩/১২)। 'কশ্চিন্নিষেকো বলবত্তরঃ--- (১/৩/২৩) গর্ভাধানের (গর্ভসঞ্চার) অর্থাৎ জীবাত্মার মাতৃগর্ভে প্রবেশের সময়টি জাতকের সঠিক জন্মলগ্ন--- Infartilization of Ovam, শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময়টি নয়। জীবাত্মার গর্ভপ্রবেশ দ্বারা গর্ভধানের সময় জীবের বিধি লিখন হয়ে যায়। ওই সময় জীবাত্মার নির্দেশে গ্রহগণ রাশিচক্রের যথাস্থানে স্থাপিত হয়ে যায়, মানুষের ভবিষ্যৎ জানার জন্য, যাতে মানুষ সঠিক পথে চলতে পারে। যোগ- জ্যোতিষ-তন্ত্র অভ্যুদয় লাভের পথমাত্র। শাস্ত্রের রহস্য গুরুমুখে বা সাধুমুখে জেনে নিতে হয়। নচেৎ বিপথগামী হতে হয়। তেমনি জ্যোতিষশাস্ত্রের দুটি অংশ— সার ও অসার। অসার অংশ হলো বিভিন্ন বিশ্বাস, মতবাদ নিয়ে গঠিত। সার অংশ হলো শ্রেয়োলাভের পথে যাওয়া অর্থাৎ ইষ্টলাভ করা। □

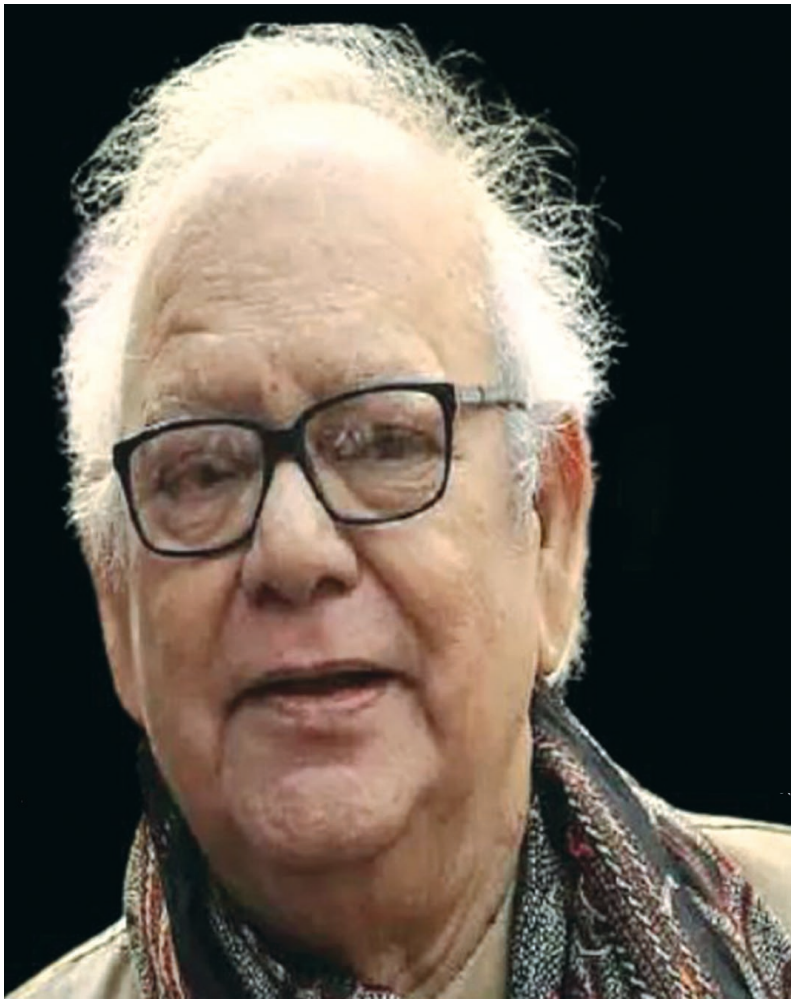

বুদ্ধদেব গুহর কথাসাহিত্যে দেশ

রঞ্জিত কুমার ভরদ্বাজ

সাম্প্রতিক বাংলা কথাসাহিত্যের কীর্তিমান স্রষ্টাদের মধ্যে বুদ্ধদেব গুহ জনপ্রিয় তাঁর রচনার বিশিষ্ট স্বাদের জন্য। সম্প্রতি পরলোকগত এই লেখকের রচনার প্রাচুর্য ও বিষয়বৈচিত্র্য মনযোগী পাঠককে বিস্মিত করে। বুদ্ধদেবের সাহিত্যিক-জীবন মোটামুটি পঁয়ষট্টি বছরের (১৯৫৭-২০২১)। তাঁর গ্রন্থসংখ্যা স্থির করা ও বিবরণ দানে কিছু অসুবিধা দেখা দেয়— একই রচনা বিভিন্ন সংকলনে একাধিক নামে গ্রন্থিত।

আবার, অধিকাংশ সংকলনের প্রকাশকাল দেখানো হয়েছে ষাটের দশক, কিন্তু কাহিনির কোনো কোনো প্রসঙ্গ কাল-বিপর্যয়-দুষ্ট। যেমন, 'পাখিরা জানে' উপন্যাসের প্রকাশকাল লেখা আছে ১৯৬৫, জ্যৈষ্ঠ (?); অথচ কাহিনিতে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের ২৫ বছর হয়েছে, হিমি মোবাইল ফোন ব্যবহার করছে...। বুদ্ধদেব গুহর ছয়টি উপন্যাস, করুণা প্রকাশনী, ১৯৫৭ জানুয়ারি-র অন্তর্গত 'সোপর্দ' উপন্যাসে (সাহিত্যম, প্রকাশ ১৯৬৫) নায়ক মনুর আক্ষেপ স্বাধীনতা পাওয়ার পঁয়ত্রিশ বছর পরেও। (তা হলে ১৯৮২ সাল) দেশের সাধারণ মানুষের দুর্দশা লাঘব হলো না; নকশাল আন্দোলনের স্মৃতিচারণ করতে সে উত্তেজিত হয়। আবার, 'পুজোর সময়' উপন্যাসের প্রথম প্রকাশ বলা হয়েছে ১৯৬৫, কিন্তু কাহিনিতে ১৯৮৭-তেও তথাকথিত শিক্ষিত ভদ্রলোকের উঁচু-নীচু জাতবিচার, গোঁড়ামির নিন্দা আছে, এক স্থানে বলা হয়েছে— 'রাজীব গান্ধী পাওয়ারে'।'

'যুযুধান' প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৭২/মে ১৯৬৫, বিদ্যোদয়। অথচ, যুযুধানের ভাবনায় এক স্থানে আছে ১৯৮৮-৮৯-এর I^T. Assessment আগস্ট মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে। এরকম কাল-বিপর্যয় লক্ষ্য করা যায় 'আইবুড়ো দুই বুড়োর গল্প' উপন্যাসে। প্রথম প্রকাশ, আগস্ট, ১৯৬৫, জ্ঞান-ভবন, এখানে আছে— 'সত্তরের দশকের গোড়ার দিকের কথা।' পর্ণমোচী' উপন্যাসের প্রকাশ ১৩৭২ কিন্তু দিগন্ত চিঠিতে ইন্দিকে লিখেছে— 'আমি এই সাতানব্বইয়ের। (বম্বের তাজমহল হোটেলের) ট্যারিফের কথা বলছি।' অনুমান করা যেতে পারে, লেখক এক একটি রচনা বিভিন্ন অবকাশে পরিবর্ধিত ও সম্মার্জনায় সমকালীনতা সঞ্চারে মনোযোগী ছিলেন।

তাঁর রচনার বিষয়গত পরিধি বহুবিস্তৃত— শিকারের গল্প, আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথা, পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি ও অর্থনৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণ, আর বহুসংখ্যাক গল্প উপন্যাস।

চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টের পেশায় দেশের বিভিন্ন ছোটো-বড়ো শহরে, শিল্পাঞ্চলের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ যেমন হয়েছে, তেমনি তৃপ্ত হয়েছে তাঁর লেখক-সত্তার আকাঙ্ক্ষা। তাঁর ভ্রমণ-পিপাসু মন বারে বারে তাঁকে নিয়ে

ফ ঃ ৫

গেছে মহানগর থেকে দূরে, প্রকৃতির কাছে, মাটির কাছাকাছি থাকা নাম পরিচয়হীন মানুষগুলির মাঝে। অবশ্য ট্যুরিস্টের মতো আলগোছে দেখা বা সৌখিন ফোটোগ্রাফারের দৃষ্টিতে নয়। অন্তরের প্রেরণায়, স্বদেশের সার্বিক প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভের অকৃত্রিম আগ্রহ থেকে সঞ্চিত জ্ঞান, উপলব্ধি তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে আঞ্চলিক জীবনের সাহিত্যে রূপদানে।

বুদ্ধদেব গুহর লেখা এই শ্রেণীর কয়েকটি উপন্যাসের নাম এখানে উল্লেখ করা যাক— আরণ্য; কোয়েলের কাছে; গামহারডুংরি; জগমগি; কোজাগর; হেরিয়ালি; পরদেশিয়া; পামরি; সুখের কাছে; সাসানডিরি; সোপর্দ; একটু উষ্ণতার জন্যে; শালডুংরি; লবঙ্গীর জঙ্গলে; অদল বদল; দীপিতা; মাধুকরী; চান্দ্রায়ন; আলোকঝারি (আলোকঝারির দিনগুলি)। লেখকের কথায়, 'ষাটের দশকের গোড়া থেকে আশির দশকের গোড়া পর্যন্ত প্রেমই আমার অধিকাংশ গল্পের উপজীব্য বিষয় ছিল। তারপর থেকে প্রায় প্রত্যেকটি গল্পের বিষয়ই ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক দায়বদ্ধতার দিকে ঝুঁকেছে।' —তাঁর 'প্রিয় গল্প' বইয়ের ভূমিকায় বুদ্ধদেবের এই কথাটি, শুধু গল্প নয়, ভিন্ন শ্রেণীর রচনা সম্পর্কেও সত্যি।

'চাপরাস' উপন্যাসে কেন্দ্রীয় চরিত্র চারণ চট্টোপাধ্যায়ের হিমালয়ের বিভিন্ন তীর্থস্থান চাক্ষুষ করার আগ্রহ ও নানান ভাবনা, উপলব্ধি পাঠককে উদ্বুদ্ধ করে। লেখকের পর্যবেক্ষণ, 'কত বড়ো দেশ এই ভারতবর্ষ। কত বিচিত্র পেশার, বিচিত্র নেশার মানুষের সমাহার এখানে। দেশকে ভালো করে না দেখলে, দেশের মানুষকে ভালো করে না জানলে, তাদের সমব্যথী না হলে মানুষ হয়ে জন্মানোই বৃথা বোধ হয়।' হিন্দুধর্ম সম্পর্কে তার অভিমত— 'এই ধর্মে আচার, আচরণ, রেজিমেন্টেশন, অন্য ধর্মের চেয়েও অনেক কম দৃশ্যমান, কিন্তু ফল্গুর বালি খুঁড়লেই তবেই যেমন জল বেরোয়, তেমনই কোনও শিক্ষিত ইংরেজিনবীশ, ধরমে আপাতত অবিশ্বাসী উচ্চন্মন্য হিন্দুকে খোঁচাখুঁচি করলে হিন্দুত্ব যে নিহিত আছে তার চামড়ার নীচে, তখনই তা বোঝা যাবে।' একথা স্বীকার করেও স্বাধীন ভারতে রাজনৈতিক খল উদ্দেশ্যে, চাটুকারিতার পন্থ হিসেবে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি, দেব-দেবী সম্পর্কে কথায় কথায় তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার প্রবণতা চারণকে ক্ষুব্ধ করে, সে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের হিন্দুদের উপেক্ষা আর মুসলমানদের তোষণ করার বিরোধী।

তাঁর রচনায় কাহিনি গড়ে উঠেছে প্রকৃতির রমণীয় দৃশ্য, শব্দ, গন্ধের নিবিড় সন্নিদ্ধতায়। ঘটনাবলীর পটভূমি হয়ে উঠেছে পুরোভূমি, পাত্রপাত্রীর পাশাপাশি স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ অঞ্চলটিও যেন কাহিনিতে এক সজীব সত্তা, উপলব্ধি করা যায় নানাভাবে চরিত্র ও ঘটনাবলীর সঙ্গে তার নিবিড় সংযোগ।

বস্তুত, বিভিন্ন অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি-পাহাড়, মালভূমি, নদী, জলগাওয়া, সূর্যরশ্মি ও চন্দ্রালোক, পশুপাখি ও স্থানীয় মানুষের স্বভাব, জীবিকা, জীবনকথা শোনানোর মধ্যে স্বদেশের প্রত্যক্ষ রূপ বাণীবদ্ধ করাই মনে হয় এই লেখকের বিশিষ্ট বাসনা। 'পথের পাঁচালী', 'ইছামতীর' লেখক এক জায়গায় বলেছেন যে, আমরা যখন পৃথিবীকে ভালোবাসার কথা বলি, সে পৃথিবীকে কিন্তু এক নির্দিষ্ট ভূখণ্ড আর পারিপার্শ্বিকের মধ্যেই চিনি। বুদ্ধদেব অঞ্চল বিশেষকে কাহিনির কেন্দ্রে রাখলেও তার রূপ, জনজীবনের ছন্দ পরিস্ফুট করেছেন এ দেশের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে।

'আরণ্য' উপন্যাসের একটি চরিত্র, চিত্রশিল্পী গামহার তার ফরাসিনী বান্ধবী জুনিপারকে ভারত দেখানোর জন্য এ দেশের জঙ্গলে নিয়ে আসতে চায়। তার বিশ্বাস— 'জঙ্গল না দেখলে তো ভারতবর্ষকে দেখা হয় না। কলকাতা, দিল্লি, বম্বে, ব্যাঙ্গালোরে আর যাই হোক আসল ভারতবর্ষ তো নেই।' 'যে কবি, যে লেখক, যে শিল্পী এই বনময় ভারতবর্ষকে না দেখলেন, না অনুভব করলেন বুকের মধ্যে, তাঁর জীবনই বৃথা।' গামহারের এই কথা অত্যুক্তি হলেও লেখকের মানসিকতার একটি দিক চেনা যায়।

বুদ্ধদেব তাঁর প্রকৃতি-চেতনা সম্পর্কে যে কথা বলেছেন তাঁর রচনার বিভিন্ন অংশে তার বিপরীত সাক্ষ্য দেয়। 'পর্ণমোচী' উপন্যাসে নায়কের মুখে লেখক বলেছেন— 'আমি প্রকৃতিকে বিজ্ঞানীর চোখে তেমন করে দেখিনি...দেখেছি শুধু প্রেমিকের চোখ দিয়ে।' অনেক স্থানে কাহিনির বর্ণনাংশে অপ্রয়োজনে যুক্ত হয়েছে উদ্ভিদবিজ্ঞানের প্রসঙ্গ, গাছপালার বৈজ্ঞানিক নামের তালিকা। ওই উপন্যাসে আমেরিকা থেকে দিগন্তকে লেখা চিঠিতে ইন্দির ভাবনা— আমরা নানান রোগ, বিধ্বংসী যুদ্ধ নিয়ে সদা আতঙ্কিত কিন্তু আরণ্যহীন পৃথিবী যে কী সঙ্ঘাতিক অভিশাপ, তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। সামান্য কিছু গল্প-উপন্যাসের কথা বাদ দিলে, বলা যায় এই লেখকের যাবতীয় রচনার মধ্যে সক্রিয় তাঁর দেশানুরাগ। পরাধীন ভারতের গ্লানি, স্বাধীনতা সংগ্রামের নানা প্রসঙ্গ, বিপ্লবীদের কার্যকলাপের কিছু বিবরণ যেমন আছে তেমনি আছে দেশভাগের সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়ার কথা।

সমাজব্যবস্থার বিভিন্ন প্রসঙ্গ, ত্রুটি বিচ্যুতির কথা বললেও ভারতবর্ষের প্রতি তাঁর অন্তরের ভালোবাসা, গৌরববোধ নানা সূত্রে ব্যক্ত হয়েছে। লক্ষ্য করা যায়, ভূপ্রকৃতি, নিসর্গ-পরিবেশ প্রকৃতির স্থানীয় বিশিষ্টতা উন্মোচনে তিনি অক্লান্ত, কিন্তু বিস্মৃত হন না স্বদেশের বৃহত্তর প্রেক্ষাপট ও তার মহিমা। এই কারণেই, কয়েকটি রচনায় ঘটেছে দেশাত্মবোধের আবেগে ভারতের প্রশংসাবাচক মন্তব্যের কিছু পৌনঃপুনিক অবতারণ। স্বাধীনতা লভের পর দেশের শিল্পায়নের সাফল্যে তিনি উচ্ছ্বসিত। 'পামরি' উপন্যাসের মুখবন্ধ 'লেখকের কথা'য় জানিয়েছেন বছরে হাজার কোটিরও বেশি নেট প্রফিট করা 'নর্দার্ন কোলফিল্ডস'-এর গুরুত্বপূর্ণ স্থান সিংগ্রাউলি ও সংলগ্ন অঞ্চলের কয়লা

খাদানের পটভূমিতে স্থানিক জীবন সম্পর্কে পাঠককুলকে অবহিত করার দায়িত্ব পালন করেছেন। 'পরদেশিয়া' উপন্যাসে কাহিনিবদ্ধ হয়েছে সাউথ ইস্টার্ন কোলফিল্ডস-এর বিলাসপুরের কোলিয়ারি কলোনি, মধ্যপ্রদেশ, ছত্রিশগড়ের অরণ্যশোভা ও বিবিধ দ্রষ্টব্যের কথা।

'মহুয়ার চিঠি' উপন্যাসে নায়ক চিঠিতে বান্ধবীকে জানিয়েছে চারটি মহাদেশ ঘুরে দেখে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে— 'আমাদের দেশের মতো দেশ নেই, আমাদের সাধারণ মানুষের মতো মানুষ নেই।' 'চানঘরে গান' উপন্যাসে বাংলাদেশের এক অনুরাগী পাঠিকা ফিরদউসকে বুদ্ধদেব লিখেছেন চিঠিতে— 'আমার দেশের মতো সুন্দর দেশ, আমাদের অরণ্যের মতো সুন্দর অরণ্য ও অরণ্যচারী মানুষও কম দেশেই আছে।' তাঁর আক্ষেপ 'শুধু নেতারাই যদি অমানুষ না হতেন।' (মহুয়ার চিঠি) 'মহুয়াকে' উপন্যাসে ওড়িশার বাংরিপোষি থেকে লেখা এক চিঠিতে বুদ্ধদেব বলেছেন— 'আমাদের এই সুন্দর হতভাগ্য দেশের পাহাড়, বনের মানুষরা এত ভালো যে, বলার নয়। এরাই আসল ভারতবর্ষ, শহরের মানুষরা কেউই নয়।' (পরি : ৮) 'ঋতু' উপন্যাসে নায়কের জবানিতে বলেছেন— 'শহুরে ভণ্ড শিক্ষিতের চেয়ে গ্রামীণ সরল অশিক্ষিত মানুষ অনেক বেশি প্রিয় আমার কাছে।'

'পুজোর সময়' উপন্যাসে দেবু তার বন্ধুকে চিঠিতে লিখেছে— ভারতবর্ষের মতো দেশ হয় না।' এই রচনায় উত্তরপ্রদেশের নিম্নবিত্ত মানুষের আতিথ্য গ্রহণকালে ভগাদা বন্ধুকে বলেছে— এই শিবাজী রাও আর মালতিরাই কিন্তু আসল ভারতবর্ষ।' এরা বড়ো না হলে দেশের উন্নতি হবে না। 'দিল্লি, বাঙ্গালোর, বম্বে, কলকাতা বা এলাহাবাদ, বেনারস দেশের স্বচ্ছলতার ইনডেক্স নয়।'

'কোজাগর' উপন্যাসে জনজাতি যুবক নানকুয়ার উক্তিতে লেখকের উপলব্ধি— 'আমরা যারাই দেশকে ভলোবাসি, দেশের কথা ভাবি, তারা সকলেই একটা জাত।' তার প্রত্যাশা এতে ওঁরও, কাহার, ভোগতা, মুণ্ডা, দোসাদ, চামার, বামুন— উঁচু নীচু ভেদ যেমন থাকা উচিত নয়, তেমনি শিক্ষিত-অশিক্ষিতের ব্যবধানও কাম্য নয়। নানকুয়া ভাবে— গ্রামের মানুষকে টেনে তুলতে না পারলে দেশ কি শুধু শহরের বাবুদের ভালো নিয়েই আগে বাড়তে পারবে? সেই বড়ো হওয়া কি বড়ো হওয়া? গ্রাম বাদ দিয়ে এদেশের থাকে কী? (তুঃ বিবেকানন্দের বাণী— সমস্ত শরীরকে প্রাতারণা করিয়া যদি কেবল মুখে রক্তসঞ্চার করা যায় তবে তাহাকে স্বাস্থ্যের লক্ষণ বলা যায় না।...) লেখকের অভিমত— রাশিয়া, চীন থেকে আমদানি করা কম্যুনিজম নয়, আমাদের চাই ইন্ডিয়ানিজম-ভিত্তিক নতুন ধরনের ওয়েলফেয়ারিজম। (মহুয়ার চিঠি)

'চাপরাস' উপন্যাসে আধুনিক বিশ্বের বিবিধ তথ্য সম্পর্কে অবহিত, কৃতবিদ্য, খ্যাতি ও সম্পদের অধিকারী চারণ চট্টোপাধ্যায় হিমালয়ের তীর্থে তীর্থে ঘুরে অনুভব করেছে— 'কত বড়ো দেশ এই ভারতবর্ষ...। কত বিচিত্র পেশার, বিচিত্র নেশার মানুষের সমাহার এখানে। দেশকে ভালো করে না দেখলে, দেশের মানুষকে ভালো করে না জানলে, তাদের জন্য সমব্যথী না হলে মানুষ হয়ে জন্মানোই বৃথা বোধ হয়।' —পৃ. ৩৪, আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির সংস্পর্শে থেকেও তার স্বদেশের মহিমা উপলব্ধিতে কৃত্রিমতা নেই। তাই একাংশ দেশবাসীর ভারতীয় ঐতিহ্য, বিশ্বাসকে নস্যাৎ করার প্রবণতা তাকে ক্ষুব্ধ করে। চারণ মনে করে ভারতীয়দের দীর্ঘকালের বিশ্বাস— পরম্পরা 'কিসসুই নয়' বলে উড়িয়ে দেবার মূলে জিগীসা নেই, আছে খল উদ্দেশ্যে চাটুকারিতা। একালের বিভিন্ন দলের রাজনীতিকরা মুসলমানদের তোষণ করতে হিন্দু দেব-দেবী, কৃষ্ণ, রাম প্রভৃতি পূজিত ব্যক্তি সম্পর্কে— তাচ্ছিল্য-জ্ঞাপক উক্তি করে— তা লক্ষ্য করেই চারণ বিরক্ত, সে জানে এই প্রবণতা ভারতের সন্তান শুধু হিন্দুদের মধ্যেই আছে (প.-৮৩)। 'মাধুকরী' উপন্যাসে পৃথু ঘোষের উক্তির তির্যকতা লক্ষণীয়— 'এখনও কিছু হিন্দু আছে দেশে, যারা হিন্দু বলে পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করে না। প্রাচীনপন্থী তো ওরা।' (পরিচ্ছেদ-৪৮) উত্তরাখণ্ডের যুবক পাটন ব্রাহ্মণসন্তান চারণকে কটাক্ষ করে বলেছে যে তার নিজের ধর্ম সম্পর্কে হীনম্মন্যতা', হিন্দুত্ব অস্বীকার করার চেষ্টা হাস্যকর।' অবশ্য একথাও ঠিক যে ভারতবর্ষে, বিশেষ করে, পশ্চিমবঙ্গে, এখন নিজেকে হিন্দু বলে পরিচয় দেওয়াটা আউট অব ফ্যাশন।' (চাপরাস, পৃ.-৪০) 'পাখিরা জানে' উপন্যাসে 'এখন তো পুজো করা, পার্বণ মানা, ধর্মাচরণ করাটাও আউট অব ফ্যাশন। বুদ্ধিজীবীদের 'ইমেজ'-এর পক্ষে ক্ষতিকারক।' (পরি-৩)। অথচ রাজনীতিকদের, মন্ত্রীদের ফ্যাশন মুসলমানদের ইফতার অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করা। সেটা করা কুসংস্কার নয়। তা করাটা গর্বের ব্যাপার। আমাদের নিজেদের কথা ভাবলেও লজ্জা হয়। এমন আত্মবিস্মৃত জাত বোধ হয় আর নেই। আমরা ইংরেজদের তো বটেই, পারসিক, মোগল, তুর্কি ইত্যাদিদের, তা তাঁরা, লুটেরা বা ধর্ষণকারীই হোন, কুষ্ঠি-ঠিকুজি মুখস্ত করে রাখি কিন্তু আমাদের নিজেদের পৌরাণিক কাহিনিগুলো তো বটেই, ইতিহাসও জানি না। জানতে লজ্জাবোধও করি।' 'পর্ণমোচী' উপন্যাসে দিগন্ত লিখেছে ইন্দি সেনকে।

চারণ বুঝেছে আধুনিক ভারত 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র সাংবিধানিক ও ব্যবহারিক আদর্শের প্রকৃতি ভণ্ডামি মাত্র। 'অদল বদল' উপন্যাসে আয়ারল্যান্ড থেকে যৌবনকালে আসা মিশনারি এখন প্রৌঢ়, নিছক এক সাধারণ গরিব ভারতীয় বলে পরিচয় দেন। বলেন— 'আমাদের দেশটা এত বড়ো, এত সুন্দর, এত সরল, আমাদের জনজাতিরা এমন যে গরিব, তাও আমার জানা ছিল না। অথচ এত হাসিখুশি তারা। কথায় কথায় হেসে গড়িয়ে পড়ে।' এর বিপরীতে স্বাধীন ভারতে নাগরিক মানুষ হয়েছে স্বার্থপর,

লোভী, অর্থগৃধ্নু। অরণ্য-আশ্রিত, শহর থেকে দূরের প্রকৃতি-ঘেঁষা মানুষের তুলনায় সভ্য সমাজের নিকৃষ্টতার রূপ নানা রচনায় দেখিয়েছেন এই লেখক। 'মহুলসুখার চিঠি' উপন্যাসে লিখেছেন— 'লোভ, ঈর্ষা, দ্বেষ পরশ্রীকাতরতা, সমস্ত রকম ইতরামি এই সবই এখন ভদ্র-সভ্য শিক্ষিত মানুষের প্রধান চারিত্রিক লক্ষণ।'

—ভালোমানুষি, সরলতা, সহৃদয়তা, এই দেশে একালে মুর্খামি বলে চিহ্নিত হচ্ছে— তা প্রত্যক্ষ করে লেখক দুঃখ আর লজ্জা বোধ করেন। (মহুয়ার চিঠি)

বিশেষভাবে একালের রাজনৈতিক নেতাদের নীতিহীন আচরণ আর আত্মম্ভরিতার কথা একাধিক রচনায় বলেছেন। 'রাজনীতির মতো পেশা আর দুটি নেই আজকাল। দু'নম্বর নেতায় আর দেশসেবকে দেশ ছেয়ে গেছে।' চাপরাশ-এর চারণও 'দু নম্বরি নেতা'র সঙ্গে, ভণ্ড, নকল অন্যান্য পেশার মানুষের, এমনকী সাধু-সন্ন্যাসীর কথাও বলেছে। (পৃ. ১৭) একালে আমাদের নেতাদের অমানুষ বলে উল্লেখ করতে কুণ্ঠিত হননি সমাজসচেতন লেখক।

'পরদেশিয়া' উপন্যাসে পর্ণ মিত্র আর অরার আলাপে নেতাদের চালচলনে ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে। নেতা কেউ হাজির হলে অন্য পর্যটকের আগে থেকে করা ডাকবাংলোর রিজারভেশন বাতিল করে দেয় সরকারি কর্তৃপক্ষ। আরও অন্যায় কথা— 'অনেক সময় ঘরে লোক থাকলে তাঁকে ঘর খালি-করে দিতে হয়।' লেখকের বিরক্তি অরা-পর্ণর কথায় ফুটে উঠেছে— 'পাবলিক সারভেন্টসরা কোথায় জনগণের চাকর হবেন, তা না তাঁরাই জনগণকে চাকরের মতো ট্রিট করেন। এমন ঘটনা ইংল্যান্ডে, কানাডাতে, স্টেটস-এ ঘটার কথা কেউ ভাবতেই পারে না।' (পৃ. ৪৬) তারা একথাও বলেছে যে— মানুষ হিসেবে ব্যক্তির এই অবমূল্যায়নের জন্য ভোটার রূপী জনসাধারণের আত্মসচেতনতার অভাব, নিশ্চেষ্টতাই দায়ী।

'মহুয়াকে' উপন্যাসে একটি চিঠিতে (১৪নং) লিখেছেন— 'আজকে ভিআইপি মানেই তো পোলিটিশিয়ান। লেখক, গায়ক, চিত্রকর, বিজ্ঞানী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার কেউই ইম্পর্ট্যান্ট নন এ দেশে। চক্ষুলজ্জা ব্যাপারটা বিন্দুমাত্রও থেকে থাকলে, বোধহয় রাজনৈতিক নেতা হওয়া যায় না।' 'চাপরাস' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র চারণ চট্টোপাধ্যায়ের ভাবনায় ব্যক্ত হয়েছে এ দেশের ঐতিহ্য ও সময়কালীন জীবনাচারের নানা তথ্য।

এ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের নানা স্তরের মানুষের কাহিনি বিন্যাসে লেখক রাজনৈতিক শাসন-ব্যবস্থা ও আর্থসামাজিক অবস্থার, গতিপ্রকৃতির প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন কাহিনির ধারাকে ক্ষুণ্ণ না করে।

কথাকার বুদ্ধদেব স্বাধীন ভারতে দলীয় রাজনীতির দাপট আর সেই সূত্রে নেতাদের লোভ, স্বার্থপরতা ও শহুরে মানুষের মূল্যবোধের অবক্ষয় দেখিয়েই ক্ষান্ত হননি, বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক দুর্দশার প্রতিকারের কিছু উপায়ের ইঙ্গিতও দিয়েছেন। 'যাঁরা বংশ পরম্পরায় ভারতের মালিক থাকতে চান, তাঁদের ঘৃণার সঙ্গে, শীতলতার সঙ্গে উপেক্ষা করতে হবে।' —মহুয়ার চিঠি।। 'ঋভু' উপন্যাসে বলেছেন— 'এ দেশ কারোই বা কোনো বিশেষ পরিবারের নিজস্ব জমিদারি নয়।' এই সত্য মনে রেখে জনতা, তথা ভোটাররা তাঁদের গুরুত্ব উপলব্ধি করে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে তাঁদের অভিযোগ জানতে যেন দ্বিধা না করেন।

একমাত্র গণ-চেতনার জাগরণ, অধিকারবোধ চালিত সক্রিয়তাই সাধারণ ভারতীয়র নিঃসীম দারিদ্র্য, লাঞ্ছনা মোচন করতে পারে। 'জনগণ যদি সারমেয়-শাবকের মতো হয়, তবে তাদের নেতা ব্যাঘ্র-শাবক হবে কী করে?'

জনসাধারণের দারিদ্র্য, বঞ্চনা অপমানের কথা, সমাজব্যবস্থার ত্রুটির কথা বললেও কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে সাফল্যের কথা শোনাতে কার্পণ্য করেননি এই লেখক।

ভারতীয় জনসাধারণের দারিদ্র্য-মোচনের, প্রধান অন্তরায় জনসংখ্যার আধিক্য। জনসংখ্যা-নিয়ন্ত্রণে কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণে রাজনৈতিক কারণে শাসক-দলের অনীহা, ফলে ভারতের আর্থ- সামাজিক সংকট নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে 'পরদেশিয়া' উপন্যাসের নায়িকা অরা। সে বলেছে— 'নেহরু পরিবার দেশের যা তো করেছেনই চল্লিশ বছর ধরে, এখনও কি তার সংশোধন হবে না?'

স্বাধীন ভারতে পশ্চিমবঙ্গের দুরবস্থা, কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার উল্লেখ ক্ষোভ প্রকাশে যেমন কুণ্ঠাহীন, তেমনই আক্ষেপ করেছেন এ রাজ্যের কর্মসংস্কৃতির বিনাশে বামফ্রন্ট সরকারের ভূমিকায়। একই সময়ে অদর্শ ও মূল্যবোধের অবক্ষয়, বিশেষত নগরজীবনে, চিনিয়ে দিয়েছেন কয়েকটি গল্প-উপন্যাসে...।

বুদ্ধদেবের আদি বাড়ি রংপুর কিন্তু তাঁর জন্ম ও পড়াশোনা প্রায় সবটাই কলকাতায়। তাঁর পরিবারকে দেশভাগের ফলে উদ্বাস্তু হতে হয়নি, কিন্তু বাঙ্গালি জাতির ওপর এই দুর্যোগের অভিঘাত তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন। রিফুজি হয়ে আসা মানুষের জিজীবিষা, প্রতিকূলতাকে নস্যাৎ করে মানবিক বৃত্তির প্রবহ অনুভবযোগ্য করেছেন কয়েকটি গল্পে, উপন্যাসে।

স্বাধীন ভারতের নতুন প্রজন্ম জানেই না ব্রিটিশরাজের তৈরি দুর্ভিক্ষ আর পূর্ববঙ্গে, বিশেষ করে নোয়াখালি, চট্টগ্রামে, ঢাকায় ব্যাপক বাঙ্গালি-হিন্দু হত্যার কথা। লেখকের দুঃখ হয় যে, সমসাময়িক তথাকথিত 'বুদ্ধিজীবী' ও নেতার সেই বর্বরতার ঘটনা ও তার সুদূরপ্রসারী ক্রিয়াকে যেন পুরোপুরি অস্বীকার করতে চান, 'এমনই ভাব যেন কিছুই ঘটেনি।' কেন্দ্রীয় শাসক দলের বাঙ্গালি উদ্বাস্তুদের প্রতি সহানুভূতির অভাব, পশ্চিমবঙ্গকে নানা অজুহাতে বঞ্চনার কথা বলতেও কুণ্ঠিত হননি 'ঋভু', 'অ্যালগি' উপন্যাসের লেখক। □

মুসহর সমাজে ডাক্তারবাবু আজ ঈশ্বর

নিজস্ব প্রতিনিধি।। এ কাহিনি এক ডাক্তারবাবুর। নাম ডাঃ শঙ্কর নাথ ঝা। কিন্তু তাঁর কথা বলার আগে আমরা এমন একজনের কথা বলতে চাই যার কথা না জানলে ডাক্তারবাবুর মহত্ত্বকে ঠিক বোঝা যাবে না।

সেই দিনটা ছিল অন্যান্য দিনের মতোই সাধারণ। বিহারের সীমা কুমারী সংসারের কাজকর্ম করছিল। হঠাৎ ওর বাবা এসে ওকে তৈরি হয়ে নিতে বললেন। কারণ বাড়িতে কিছু অতিথি আসছেন। সীমা তৈরি হলো এবং অচিরেই অতিথি আপ্যায়নে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কিন্তু ব্যাপারটা এত সহজ ছিল না। কিছুক্ষণের মধ্যে ও বুঝতে পারল বাড়িতে যারা এসেছেন তারা আসলে ওর বাবা-মা'র সঙ্গে ওরই বিবাহের ব্যাপারে কথা বলতে এসেছেন। মাত্র সতেরো বছর বয়সে সীমা অসহায় অবস্থায় পড়ল। মুহূর্তের জন্য মনে পড়ল দিদির কথা। ক্লাস সিক্সে পড়ার সময় যার বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সীমার কথায়, 'আমার বিয়ে যে ঠিক হয়ে গেছে সে ব্যাপারে আমার কোনও ধারণাই ছিল না। বাবার কাছে গিয়ে বললাম, আমি এখন বিয়ে করতে চাই না। বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, তা হলে তুমি এখন কী করবে?'

বিহারে ৪০.৮ শতাংশ মহিলার অর্থাৎ প্রতি দশ জনের মধ্যে চারজন মহিলার বিয়ে আঠারো বছর বয়স হওয়ার আগেই হয়ে যায়। রাজ্যের ৩৮টি জেলার মধ্যে ১২টি জেলায় বাল্যবিবাহের সংখ্যা সব থেকে বেশি। বলাবাহুল্য, সীমার হোমটাউন জামুই সেরকমই একটা বাল্যবিবাহ-প্রবণ শহর। সুপৌল, পূর্ণিয়া, সাহারসা ও বেগুসরাইও এরকম কয়েকটি জায়গা।

সাধারণত শিক্ষা ও সচেতনতার অভাবের কারণেই বাল্যবিবাহের প্রবণতা বাড়ে। কিন্তু সেদিন সীমা এই অচলায়তনে আঘাত হানতে সমর্থ হয়েছিল। তার নিজের কথায়, 'বাবাকে বললাম আমি এএনএম (অক্‌জিলিয়ারি নার্স অ্যান্ড মিডওয়াইফ) হতে চাই। ভাগ্য ভালো ছিল বাবা কোনও আপত্তি করেননি। সেই জন্যেই আমার বিয়ের কথাবার্তা আর এগোয়নি'।

সীমার বাবা যে শেষ পর্যন্ত মেয়ের ইচ্ছে মেনে নিলেন, এটা কোনও কাকতালীয় ঘটনা নয়। এখানেই ডাঃ শঙ্কর নাথ ঝা'র সব থেকে

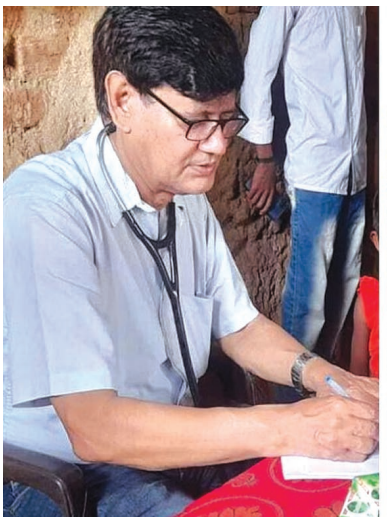

বড়ো ভূমিকা। তিনি পেশায় শিশু চিকিৎসক। গত প্রায় দু'দশক ধরে তিনি জামুই শহরে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে একটা সচেতনতা গড়ে তুলেছিলেন। সীমার মতো চারশো সাত জন মুসহর সম্প্রদায়ের বাচ্চাকে তিনি প্রাথমিক শিক্ষাদানের মাধ্যমে বাল্যবিবাহ এবং শিশুশ্রমের বিরুদ্ধে সচেতন করে তুলেছেন।

ভারতের পিছিয়ে পড়া জনসমাজের জাতপাত ব্যবস্থার একেবারে শেষের দিকে এই মুসহরদের অবস্থান। ভোজপুরী ভাষায় মুসহর মানে যারা ইঁদুর খায়। একসময় মুসহরদের প্রধান পেশা ছিল ইঁদুর ধরা। ডাঃ ঝা এই এলাকায় প্রায় ৪০ বছর প্র্যাকটিস করছেন। তাঁর চেম্বারে মুসহরদের অনেকেই আসে। ডাঃ ঝা বলেন, 'ওদের বাচ্চাগুলো সারা বছর অপুষ্টিতে ভোগে। এমনকী, কারোর বাচ্চা যদি মারাও যায় তাহলেও কেউ একফোঁটা চোখের জল ফেলে না। শিশুমৃত্যুর হার এখানে এতটাই বেশি যে এরা সন্তান হারানোর শোকও অনায়াসে গিলে ফেলতে পারে। আমি প্রায়শই দেখি তেরো-চোদ্দ বছরের মেয়েরা কোলে-কাঁখে বাচ্চা নিয়ে ঘুরছে। এইসব ঘটনা আমাকে কষ্ট দেয়'। ডাঃ ঝা'র আফশোস এখানকার বাচ্চারা যদি লেখাপড়া শিখে গ্র্যাজুয়েট হতে পারত কিংবা নিদেন লিখতে পড়তেও শিখত তাহলে ওদের জীবন অনেকটাই বদলে যেত। কিন্তু সচেতনতা কম। মেয়েদের কথা তো কহতব্য নয়, গ্রামে এমন কোনও ছেলেও খুঁজে পাওয়া যাবে না, যে ক্লাস টেন পাশ।

এদের উন্নতির জন্য কাজ করছেন ডাঃ শঙ্কর নাথ ঝা। ইতিমধ্যেই অনেকটা সচেতনতা এসেছে। মেয়েরা আঠারো বছর বয়স হওয়ার আগে বিয়ে করতে চাইছে না। ছেলেরাও অন্তত মাধ্যমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বুঝেছে। ফলে বাল্যবিবাহ ও শিশুশ্রমের বাড়াবাড়ি অনেকটাই কম হয়েছে। কিন্তু একা ডাঃ শঙ্কর নাথ ঝা'র মতো মানুষদের পক্ষে কতটাই-বা পরিবর্তন আনা সম্ভব? সমাজের প্রতিটি মানুষ এগিয়ে না এলে এই মারাত্মক সামাজিক ক্ষতের চিকিৎসা সম্ভব নয়। সুতরাং দায়িত্ব নিতে হবে সকলকেই। ▯

অঙ্কের খেলা

তখন সকাল আটটা। অমেয় জ্যাঠার পুবের ঘরে বসে আনন্দ নিজের প্রকাণ্ড আঁকার খাতায় ছবি আঁকছে আর পাশে বসে অধীর নানা প্রসঙ্গে তাকে সহযোগিতা করছে। জ্যাঠা ঘরে এসে জিজ্ঞেস করলেন, কী হচ্ছে? আনন্দ

বলল, আজ বিকেল পাঁচটা নাগাদ আঁকার স্যারের কাছে যেতে হবে, কাজ না হলে কপালে দুঃখ আছে।

আঁকা তাড়াতাড়ি শেষ করে আনন্দকে এক স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়তে দেখে অমেয় জ্যাঠা একটু হেসে বসসেন, এই এত সাজানো রং দেখে আমার একটা অঙ্কের কথা মনে পাড়ে যাচ্ছে, শুনবে? দুজনেই সম্মতি প্রকাশ করলে জ্যাঠা গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বলতে শুরু করলেন।

ধরো, একটি ঘরে ছ'জন ব্যক্তি উপস্থিত। তাদের যে কোনো দুজন পরস্পরের বন্ধু বা শত্রু। তাহলে সেই ছ'জনের মধ্যে তোমরা অন্তত তিনজন পাবেই, যারা তিনজনই পরস্পরের বন্ধু বা শত্রু। বলতে পারো কী করে?

আনন্দ আর অধীর কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করে। তারপর নীরবতা ভেঙে অধীর বলে, উত্তরটা যদি একজন ব্যক্তির পরিপ্রেক্ষিতে ভাবি তাহলে ব্যাপারটা একটু সহজ হতে পারে। একটি ব্যক্তির সামনে যদি পাঁচজন লোক থাকে আর দু'রকমের সম্পর্ক (বন্ধু বা শত্রু) স্থাপন করা সম্ভব, তাহলে এমন একটি সম্পর্ক যা সে তিনজন বা তার চেয়ে বেশি ব্যক্তির সঙ্গে রাখবে। কিন্তু এখান থেকে কী করে এগোব তা বুঝে উঠতে পারছি না।

জ্যাঠা একটু হেসে অধীরের পিঠ চাপড়ে বললেন – বেশ, অনেকটা এগিয়েছ, বাকিটা আমি বলে দিচ্ছি।

প্রথমে মানুষগুলোকে বিন্দু ধরে নাও। বিন্দুগুলোর নাম দাও A, B, C, D, E, F. এবার বলে রাখি, যদি দুই ব্যক্তি বন্ধু হয়, তাহলে আমরা তাদের জন্য নির্ধারিত দুই বিন্দু একটি স্ট্রেট লাইন দ্বারা যুক্ত করব। আর যদি দুই ব্যক্তি শত্রু হয় তাহলে আমরা তাদের দুইজনের নির্ধারিত দুই বিন্দু ডটেড লাইন দ্বারা যুক্ত করব। A বিন্দু বা ব্যক্তির পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাপারটি দেখ। অধীর যা বলেছে তা থেকে এটাই বোঝা যায় যে A ব্যক্তির তিন বা তিনের চেয়ে বেশি বন্ধু বা শত্রু থাকবে। আমরা ধরে নিলাম যে, A-র তিন বা তিনের বেশি বন্ধু। A-র তিনটি বন্ধু নিয়ে কাজ করলেই হবে। ধরে নাও, আমাদের বাছা সেই তিন বন্ধু হলো B, C, D. লক্ষ্য করো, AB, AC, AD তিনটিই হলো স্ট্রেট লাইন। তাহলে দেখতেই পাচ্ছ যে BC, CD, DB এই তিনটি লাইনের মধ্যে একটিও লাইন স্ট্রেট হলে আমরা একটা 'স্ট্রেট' লাইনের ত্রিভুজ পেয়ে যাব। যেখান থেকে সহজেই বলতে পারি যে, স্ট্রেট লাইনের ত্রিভুজের তিনটি ব্যক্তিই একে অপরের বন্ধু। যদি BC, CD, DB-র মধ্যে একটিও লাইন স্ট্রেট না হয় তাহলে BCD ত্রিভুজটি একটি 'ডটেড' লাইনের ত্রিভুজ। যার মানে দাঁড়ায় B, C, D একে অপরের শত্রু।

এখন তোমরা নিশ্চয় বুঝতে পারছ যে আমরা যা ধরেছিলাম তাতে কমপক্ষে এমন তিনজন পাবোই যারা পরস্পরের বন্ধু অথবা কমপক্ষে এমন তিনজন পাবোই যারা পরস্পরের শত্রু। এতক্ষণ আমরা যা প্রমাণ করতে চাইছিলাম, তা এখন প্রমাণিত। আমরা যেটি ধরিনি (A-র তিন বা তিনের বেশি শত্রু) তা অনেকটা এমনভাবেই হয়ে যাবে।

ঢং ঢং ঢং ! বাবা, এত তাড়াতাড়ি ৯টা বেজে গেল? জ্যাঠা বললেন, চলো খেয়েনি, আজ লুচির সঙ্গে আলুর দম হয়েছে, সঙ্গে আছে জিলিপি।

মৌনব দাস,
দ্বাদশ শ্রেণী, সাউথ পয়েন্ট হাই স্কুল।

বীর বনবাসী

চক্র বিসোই

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ওড়িয়া জনজাতি নায়ক চক্র বিসোই কন্ধ জনজাতি সমাজের মানুষ ছিলেন। ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে ওড়িশার গঞ্জাম জেলার চক্রগড়ে তার জন্ম। কন্ধ জনজাতির মানুষদের সঙ্ঘবদ্ধ করে ১৮৪৬ থেকে ১৮৫৬ পর্যন্ত ইংরেজের বিরুদ্ধে ব্যাপক লড়াই চালিয়ে যান। তাঁর নেতৃত্বে কন্ধ যোদ্ধারা নিজ নিজ হাতের আঙুল কেটে কপালে রক্ততিলক পরে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সূচনা করেন। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ লড়াইয়ের ডাক দেন। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজরা তাঁকে বন্দি করে এবং নির্মমভাবে হত্যা করে।

জানো কি?

- ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির সময় ওম্ শব্দ নির্গত হয়েছিল।।
- বেদে মহাদেব শিবকে রুদ্র নামে অভিহিত করা হয়েছে।
- জীব বৈচিত্র্যকে স্বীকৃতি দিতে দেব-দেবীরা বাহন ধারণ করেছেন।।
- বেদকে বিভক্ত করেছিলেন বলে ঋষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ণকে বেদব্যাস বলা হয়।
- কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সর্বশেষ মৃত্যুবরণকারী যোদ্ধা হলেন পিতামহ ভীষ্ম।
- ধর্ম শব্দের অর্থ হলো যা শুভবুদ্ধি ও সৎ চিন্তা ধারণ করে রাখে।

ভালো কথা

বাঘে-মানুষের লড়াই

দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুমিরমারি ফরেস্ট এলাকার গ্রামের গণেশ দাস গ্রামেরই কয়েক জনের সঙ্গে সুন্দরবনের নদীখাঁড়িতে কাঁকড়া ধরতে গিয়েছিলেন। এক মনে তাঁরা যখন কাঁকড়া ধরছিলেন, তখন হঠাৎই একটা বাঘ গণেশ দাসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে জঙ্গলের মধ্যে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল। তার সঙ্গীসাথীরা একটু ভয় না পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে নৌকার বইঠা দিয়ে বাঘকে দমাদম মারতে শুরু করে। বেশ কিছুক্ষণ পর রণে ভঙ্গ দিয়ে বাঘটি জঙ্গলে পালিয়ে যায়। গণেশ দাস ভীষণভাবে জখম হন। তার সঙ্গীরা তাকে নৌকা করে ডাক্তারের কাছে নিয়ে আসে। পরে তাকে কুলপি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সঙ্গীদের সাহসের জন্যই গণেশ রক্ষা পান। তার সঙ্গীদের প্রশংসা এখন এলাকার মানুষের মুখে মুখে শোনা যাচ্ছে।

প্রলয় সরদার, একাদশ শ্রেণী, কুলপী, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) শ দে হি প	(১) বি য় দ দা হ্ন ক র
(২) ভা মা ত তা	(২) তা র্তা র্তা বি হ ক ধা

১২ জুন সংখ্যার উত্তর

(১) উড়োজাহাজ (২) উত্তরপত্র

১২ জুন সংখ্যার উত্তর

(১) অসাধ্যসাধন (২) আশ্রমবালিকা

উত্তরদাতার নাম

(১)শিবাংশী পাণিগ্রহী, ইংলিশ বাজার, মালদা। (২) শোভা মহান্তি, বরাবাজার, পুরুলিয়া। (৩) শুভম কর্মকার, মানিকচক, মালদা। (৪) বিদ্যুৎ সরকার, বংশীহারী, দক্ষিণ দিনাজপুর।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

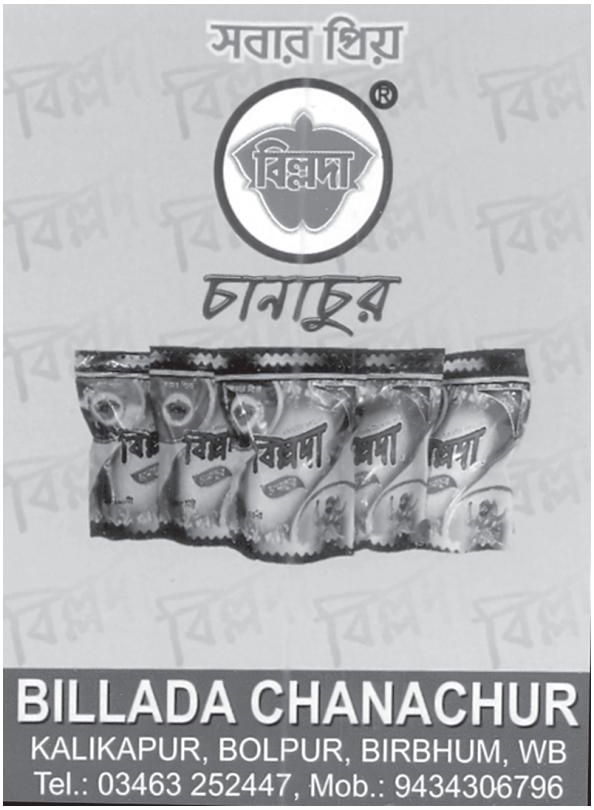

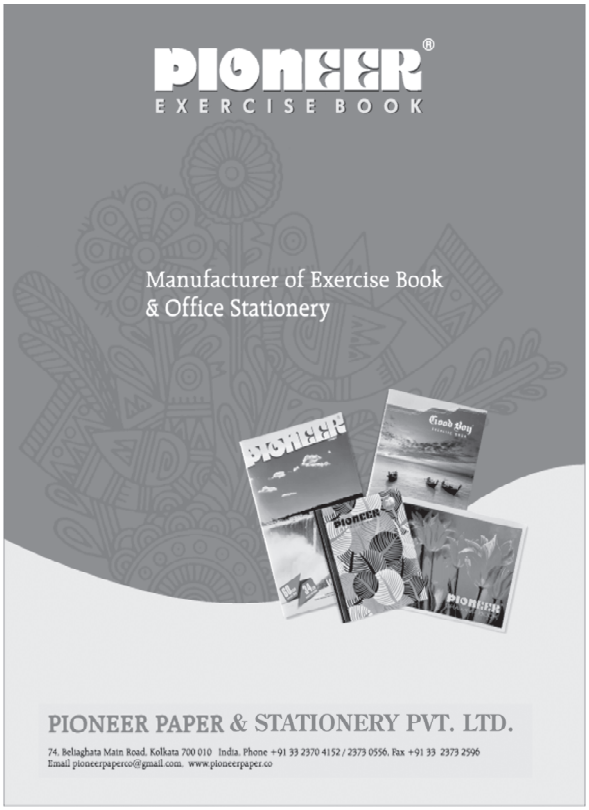

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

কেন পৃথক উত্তরবঙ্গকে চাই

আমরা যারা পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষী নাগরিক তারা দেশের বাইরে গেলে নিজেদেরকে ভারতীয় বলি। রাজ্যের বাইরে কোনো সমাবেশে সেল্‌ফ ইন্ট্রোডাকশনে বলি পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসেছি। কারণ সকলেই সেখানে ভারতীয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসেছি বললেই অনেকে বাংলাদেশির সঙ্গে গুলিয়ে ফেলে।

কুণাল চট্টোপাধ্যায়

১৯১৭ সালে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ পরিচালন সমিতিতে সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে সুকুমার রায় এবং সদ্য বিলেত ফেরত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ সাম্মানিক সভ্য হিসেবে রবীন্দ্রনাথের নাম প্রস্তাব করেন। রক্ষণশীল প্রবীণ ব্রাহ্ম নেতারা সেটি নাকচ করে দেন। ধূমপান, মদ্যপান এবং নাটক থিয়েটারে অংশ নেওয়ার বিরোধী ছিলেন তাঁরা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছাত্রীদের নিয়ে তৃতীয় শর্তটি ভঙ্গ করেছিলেন। তিন বছর পর প্রশান্তচন্দ্র তাঁর প্রস্তাবের সমর্থনে একটি পুস্তিকা ছাপিয়ে সকলের মধ্যে বিলি করেন। লেখার শিরোনামটি ছিল, 'কেন রবীন্দ্রনাথকে চাই।' বর্তমান লেখার শিরোনামটির সঙ্গে প্রশান্তচন্দ্রের প্রয়াসের কিছু মিল খুঁজে পাওয়া গেলেও যেতে পারে।

গত আড়াইশো বছরে বৃহৎ বঙ্গদেশ তার ভৌগোলিক পরিচয়ে যতবার আকার বদল করেছে তেমনটি এই ভারতের কোনো রাজ্যের ক্ষেত্রে ঘটেছে কি না সন্দেহ। দিকে দিকে দেখা গেছে বিদর্ভ, বিরাট, অযোধ্যা, পাঞ্চাল কাঞ্চীদের উদ্ধত ললাট। কিন্তু এই বঙ্গদেশের অঙ্গচ্ছেদের মতো রঙ্গ ভূভারতে বিরল। এখানকার জনবৈচিত্র্য, ভৌগোলিক অবস্থান, দেশভাগজনিত উদ্বাস্তু স্রোত, অবেহলা, অস্থিরতা, ক্ষোভ, আবেগ প্রভৃতি নিয়ে বিস্তর আলোচনা, লেখালিখি হয়েছে। বর্তমান অবকাশে সেইসঙ্গে অর্থনৈতিক দিকটির প্রতিও কিছু আলোকপাত করা প্রয়োজন।

দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদহ— এই আটটি জেলা নিয়ে প্রস্তাবিত উত্তরবঙ্গের আয়তন ২১৮৫৯ বর্গ কিলোমিটার। আয়তনের দিক থেকে এই উত্তরবঙ্গ উত্তরপূর্বের কয়েকটি রাজ্যের সমান।

স্বাধীনতার পর পূর্ববঙ্গে থেকে বাঁধভাঙা জলের মতো যে হিন্দু বাঙ্গালির স্রোত পশ্চিমবঙ্গে আছড়ে পড়েছিল, গঙ্গার উত্তরে ও দক্ষিণে তার প্রভাব ছিল ভিন্ন। দক্ষিণের বঙ্গসংস্কৃতি যেমন আগত জনস্রোতের উর্বরতায় পুষ্টি লাভ করেছিল, উত্তরে তেমনটি ঘটেনি। সেখানকার ভূমিপুত্ররা তাদের জাতিসত্তা ও সংস্কৃতির অস্তিত্বকেই প্রায় হারিয়ে ফেলেছে। এই নয়া ইহুদিরা শিক্ষায় অনেক এগিয়ে থাকায় এবং উদ্যোগী হওয়ার কারণে নিরক্ষর, নেশার দাস ও অলস ভূমিপুত্ররা কেবল ভূমিহারাই হলো না, তারা অনেকাংশে হারিয়ে ফেলল তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি।

দেশভাগের অন্য একটা ফল হলো শিলিগুড়ি শহরের দাবানলের মতো বেড়ে ওঠা ও বাণিজ্যিক গুরুত্ব বৃদ্ধি। সেই সঙ্গে প্রতিবেশী রাজ্য বিহার থেকে আসা হিন্দিভাষী জনস্ফীতিও ঘটল ব্যাপক ভাবে। এহেন আবহে গোর্খাল্যান্ড, কামতাপুরী বা গ্রেটার কোচবিহার আন্দোলনগুলোর মধ্যে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালি আর একবার সংখ্যালঘু উদ্বাস্তু হওয়ার

ফঃ ৬

সিঁদুরে মেঘ দেখতে লাগল। সাম্প্রতিককালে মালদহ ও দুই দিনাজপুরেও নতুন রাজ্যের ভূকম্পন অনুভূত হওয়ায় বাঙ্গালিরাও উত্তরবঙ্গের দাবিতে গলা মেলাচ্ছে। প্রকাশ্যে বলছে মহাকরণ বা নবান্ন মনে করে পশ্চিমবঙ্গ ফরাক্কা পর্যন্ত।

স্বাধীনতার পর ভারতে অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্য ভেঙে যথাক্রমে তেলেঙ্গানা, ঝাড়খণ্ড, উত্তরাঞ্চল, ছত্তিশগড় সৃষ্টি হয়েছে। অতীতে অসম ভেঙে গড়া হয়েছিল উত্তর পূর্বাঞ্চলের একাধিক রাজ্য। আজ পশ্চিমবঙ্গ ভঙ্গ হলে নটি হিন্দিভাষী ও দুটি তেলুগুভাষী রাজ্যের মতো তিনটি বাংলাভাষী রাজ্য গড়ে উঠবে।

এ পর্যন্ত এই রাজ্যে একজন মুখ্যমন্ত্রীও ফরাক্কার উত্তরাঞ্চল থেকে আসেননি। গনিখান চৌধুরী ছাড়া তেমন কোনো শক্তিশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকেও উত্তরবঙ্গ থেকে উঠে আসতে দেখা যায়নি। এছাড়া দুর্বল যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে দীন-দুঃখী দিনাজপুর একগাছা সরু সুতোর মতো জুড়ে আছে দুই বঙ্গের মাঝখানে। নীহাররঞ্জন যথার্থই বলেছিলেন 'এই রাজ্যের মাথা আছে, হৃদয়ও হয়তো আছে, কিন্তু সবটাই কলকাতা।'

রবি ঠাকুরের কোনো ভারতী বা নিকেতন উত্তরবঙ্গে নেই। বাংলা সাহিত্যের প্রায় সব কাহিনিই কলকাতা নির্ভর। নায়ক প্রেম করবে ভিক্টোরিয়ার বাগানে। বন্ধুর সঙ্গে দেখা করবে কলেজ স্ট্রিটে, রায়গঞ্জ বা জলপাইগুলির কোনো রেস্তোরাঁয় নয়। এমনকী ইছামতীর অপূর্ব বা স্বর্গছেঁড়ার অনিমেষদেরও কলকাতায় এনেছিলেন বিভূতিবাবু, সমরেশবাবুরা। তাই পৃথক উত্তরবঙ্গ তৈরি হলে সেখানকার ভূমিপুত্র মুখ্যমন্ত্রী এবং সেই সঙ্গে সাহিত্য সংস্কৃতির এক নতুন ভরকেন্দ্রের আশা করাই যায়।

ইংরেজিতে একটা কথা আছে, It is distance that breeds enmity. একেই ভৌগোলিকভাবে প্রতিবন্ধী, তদুপরি একেবারে দক্ষিণতম প্রান্তে তার রাজধানী। তাই একধরনের বিচ্ছিন্নতাবোধে এখানকার মানুষজন কম-বেশি আক্রান্ত। মেডিক্যাল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, রাষ্ট্রীয় পরিবহণ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে 'উত্তরবঙ্গ' যুক্ত করায় এই অঞ্চলের নাগরিককে যেন আরও বেশি বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে ওটা পশ্চিমবঙ্গ নয়, উত্তরবঙ্গ। উত্তরবঙ্গের জাতিসত্তা নিয়ে দীর্ঘদিন গবেষণা করা সৌমেন নাগের মতে কলকাতার বিদ্বজ্জন আলোচকেরা বঙ্গের সংহতি রক্ষার জ্ঞানগর্ভ ভাষণে দক্ষিণ ও উত্তরের জনজীবনের বিন্যাসকে তাঁদের বিচরণভূমি দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলির সঙ্গে এক করে দেখতে চান বলেই উত্তরের অস্থিরতার উৎসভূমিকে খুঁজে পান না।

বক্তিয়ার খিলজির হাতে ইসলামের আগ্রাসনকালে কোচ সম্রাট মল্লনারায়ণ ও তাঁর সেনাপতি বীর চিলা রায় তথা শুল্কধ্বজের গৌরবময় বিজয়গাথা এবং খিলজির পরাজয়ের গ্লানির ইতিহাস যথাযথ ভাবে স্কুলপাঠ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। ফলে উত্তাপের উৎসমুখ খোঁজার তাগিদ না অনুভব করেই পৃথক রাজ্য বা কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল গড়ার ভাবনাকে বিচ্ছিন্নতাবাদী বা সংহতি বিরোধী বলে ঘোষণা করা হয়।

কোনো রাজ্য থেকে যখন নতুন কোনো রাজ্যের জন্ম হয় সেটা কেবল প্রশাসনিক সুবিধার জন্য নতুন জেলা গঠনের মতো হয় না। এক্ষেত্রে অনেক সময়ই জননী রাজ্যটি আর্থিক ভাবে অনেকটাই দুর্বল হয়ে যায়। বিহার ভেঙে ঝাড়খণ্ড সৃষ্টির পর পূর্বতন বিহার প্রায় পুরো শিল্প ও খনি সমৃদ্ধ অংশটাই হারিয়েছে। দরিদ্র বিহার হয়েছে দরিদ্রতম। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে নবগঠিত ছোটো রাজ্যটির বিকাশ সহোদর রাজ্যটির তুলনায় বেশি হারে ঘটেছে, যেমন হিমাচল প্রদেশ। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে দেখা গেছে স্বাধীন দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশের পর বাংলাদেশের বিকাশের হার পাকিস্তানের চেয়ে বেশি। উত্তরবঙ্গ খনি, বন্দর ও বৃহৎ শিল্পসমৃদ্ধ না হওয়ার জন্য সেখানকার অর্থনীতি মূলত কৃষিনির্ভর। উত্তরপূর্বের সেভেন সিস্টার তথা সাতভাই চম্পার মধ্যে এক বোন পারুল হওয়ার সম্ভাবনা তার প্রবল। বিগত পঞ্চাশ বছরে সংগঠিত বৃহৎ কারিগরি ও উৎপাদন শিল্পে ধারবাহিক অধোগমনের দরুন পশ্চিমবঙ্গ বর্তমানে উৎপাদক রাজ্য থেকে কেবলমাত্র ভোক্তা রাজ্যে পরিণত হয়েছে। মাথাপিছু আয়ে পশ্চিমবঙ্গ আজ শেষ সাতটি রাজ্যের মধ্যে প্রথম। এখানে ২৩টি জেলার মধ্যে ১৩টি জেলাতেই বার্ষিক মাথাপিছু আয় এক লক্ষের নীচে। দেশে গড় মাথাপিছু আয় বর্তমানে ১.৩৫ লক্ষ টাকা। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে সংখ্যাটা ১.১৫ লক্ষ টাকা। এখানে উত্তরবঙ্গের আটটির মধ্যে ছটি জেলাই দারিদ্র্যকবলিত। সুতরাং এই নবীন রাজ্যটি যে Weak child of a diseased mother হতে চলেছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

কোনো যৌথ পরিবারে উচ্চ আয়ের রোজগেরে সভ্য থাকে আবার স্বল্প আয়ের সভ্যও থাকে, থাকে প্রতিবন্ধী সন্তানও। আমাদের মহাভারতের চিত্রটিও অনুরূপ। এখানে গোয়া, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু যেমন আছে তেমনই আছে লাদাখ, ত্রিপুরা, মিজোরাম, অরুণাচল প্রদেশের মতো রাজ্য। প্রতিভাবান আইরিশ ফুটবলার জর্জ বেস্ট, প্রখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা নির্মাতা ঋত্বিক ঘটক বা সম্ভাবনাময় কবি তুষার রায় যেমন স্বভাবজনিত কারণে নিজেদের প্রতিভার প্রতি সুবিচার না করায় পরিপূর্ণ ভাবে বিকশিত হতে পারেননি। তেমনি যে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি একদা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে সবচেয়ে বেশি রাজস্ব দিত, এমনকী পঞ্চাশের দশকেও যে পশ্চিমবঙ্গ দেশের অন্যতম অগ্রণী রাজ্য ছিল সেই একদা ব্রিলিয়েন্ট ছাত্রটি বর্তমানে সঙ্গদোষে হারিয়ে যাওয়া ছাত্রের মতো একটি অনগ্রসর রাজ্যে পরিণত হয়েছে।

এহেন বাস্তবকে মাথায় রেখেই দেশের কেন্দ্রীয় সরকার অত্যন্ত কুশলী ফিসক্যাল কমিশনকে সক্রিয় রেখেছে। সেখানে ধনী সমৃদ্ধ রাজ্যগুলিকে তাদের আয় বা রাজস্ব থেকে দুর্বল রাজ্যগুলির জন্য অনেকটাই ত্যাগ স্বীকারে বাধ্য করার সংস্থান রাখা হয়েছে। এটাই ভারতবর্ষের ফিসক্যাল ফেডারালিজমের মহত্ত্ব।

দ্য গল প্রায়ই একটা কথা বলতেন, আলজিরিয়া, সে তো ফরাসিই। কিন্তু আলজিরিয়ান কামু ফরাসিতে সাহিত করে নোবেল পেলেও ফ্রান্স আলজিরিয়াকে ফরাসি বানাতে পারেনি। তেমনই যতই বিমল গুরুংকে বাঙ্গালি আর দার্জিলিংকে অবিচ্ছেদ্য বলা হোক না কেন দার্জিলিংকে বাংলা করা কঠিন। হরিদ্বারের হোটেলের মতো

দার্জিলিঙের পাইস হোটেলে তাই আজও ভুল বাংলায় খাবারের মেনু লেখা দেখা যায়।

এদেশের ঝাড়খণ্ড বা ছত্তিশগড়ের মতো উত্তরবঙ্গও জনজাতি অধ্যুষিত। এখানকার ৬৫ প্রকার জনজাতির উপস্থিতি এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান কেবল ভারতবর্ষেই নয়, সারা বিশ্বে বিরল। একই সঙ্গে এটি সম্পদ এবং বাধাও। ঝাড়খণ্ড বা তেলেঙ্গানায় রাজনৈতিক নেতৃত্বদানকারী নেতার সংখ্যা যেমন একাধিক ছিল না, উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রটি তেমন নয়। এখানে গোর্খা, রাজবংশী, কামতাপুরী বা গ্রেটার কোচবিহার প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভিন্ন ভিন্ন নেতারা বিদ্যমান। এই বিভাজনের পিছনে সম্পদ বণ্টনের বৈষম্যের সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার ভূমিপুত্রদের ভাষা, সংস্কৃতি ও ইতিহাস সময় সময় ঐক্যবদ্ধ উত্তরবঙ্গ গঠনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইতিহাসে দেখা গেছে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী বাস্তব প্রয়োজনে যখন ঐক্যবদ্ধ হওয়ার রসদ সন্ধান করেছে তখনই শাসকশ্রেণী (সেটা ঔপনিবেশিক হোক বা স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশই হোক) ব্যক্তি বা শ্রেণী স্বার্থে তা হতে দেয়নি। ঐক্যের বা সংহতির কথা বলে বিচ্ছিন্নতার বীজ বুনেছে।

একটা নবগঠিত জাতিসত্তাকে খণ্ডিত করার ঔপনিবেশিক কৌশল ভালো না মন্দ সে বিচার মূলতুবি রেখে বলা যায় এ ব্যাপারে উত্তরে দার্জিলিং পাহাড়ে প্রাথমিক ভাবে কিছুটা সফল হয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি প্রথমে তামাং বুদ্ধিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের মতো ধর্মীয় গোষ্ঠীভুক্ত জনজাতিদের নেপালি জনগোষ্ঠী থেকে পৃথক করতে চাইলেন। সুবাস ঘিসিং বিরোধিতা করলে সমগ্র দার্জিলিংকে ট্রাইবাল বন্ধনীতে এনে সংবিধানের ষষ্ঠ তপশিলে আনতে চেয়েছিলেন। বামফ্রন্ট তাকে সমর্থনও করেছিল। উভয়েরই উদ্দেশ্য ছিল নেপালি হিন্দুত্ববাদী নেতৃত্বের সঙ্গে ঘিসিঙের ফাটল ধরানো। মমতাদেবী এই ফাটল প্রসারিত করতে রাতারাতি পাহাড়ে ১৫টি জাতিগোষ্ঠীর নানা উন্নয়ন বোর্ড গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে দিলেন। এক্ষেত্রে লেপচা উন্নয়ন পরিষদ আপাতদৃষ্টিতে গোর্খাবিরোধী অস্মিতাকে বাড়াতে সহায়ক হতে পারে। কিন্তু মনে রাখা দরকার, এই দার্জিলিংই দুশো বছর আগে লেপচাদের রাজ্য সিকিমের অংশ ছিল।

ঐক্যবদ্ধ উত্তরবঙ্গ ভাবনাটা দানা বাঁধার পর সেখানকার গোর্খা, কামতাপুরী, বাঙ্গালি নেতৃত্বের কুশীলবদের কাছাকাছি আসাটা খুব জরুরি। হিন্দু ডোগরা, মুসলমান কাশ্মীরী, বৌদ্ধ লাদাখিরা বহুদিন ধরে সেটা করে দেখিয়েছে। জম্মু-কাশ্মীরে রয়েছে ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী ইসলামিক পাকিস্তান ও চীন। এখানেও আছে ইসলামিক বাংলাদেশ ও চীন। আরও দুটি দেশ নেপাল ও ভুটান। সেই সঙ্গে গুরুত্ব বাড়িয়েছে শিলিগুলির মাত্র ২৬ কিলোমিটারের চিকেন নেক। সুতরাং সীমান্ত রাজ্য এবং চারটি দেশের নৈকট্যহেতু সামরিক নিরাপত্তার কারণে কেন্দ্র শাসিত রাজ্য হওয়ার পক্ষে জোরালো সওয়াল উঠতেই পারে। প্রস্তাবিত উত্তরবঙ্গ রাজ্যটির উত্তরে সুউচ্চ হিমালয় পর্বতমালা, পাদদেশে তারাইয়ের অরণ্য ও চা-বাগান। আরও দক্ষিণে সমতল কৃষিভূমি। অতীতে এই সমতলটি ২৯ হাজার পুকুর সমৃদ্ধ 'লেক ডিস্ট্রিক্ট অব বেঙ্গল' নামে পরিচিত ছিল।

স্বর্ণগর্ভা ডুয়ার্সের মাটিতে প্রকৃতি স্তরে স্তরে সাজিয়ে রেখেছে নানা প্রাকৃতিক সম্পদের উপকরণ। বছরে ২৮ কোটি কিলোগ্রাম চা উৎপাদন করে এখানকার সাতটি জেলার বাগিচাগুলো। প্রাকৃতিক সম্পদের বীজ ধারণ করে অহল্যার মতো অপেক্ষায় আছে এই অঞ্চল কবে শ্রীরামচন্দ্রের মতো শিল্পের পদধন্য হয়ে শিল্প-বন্ধ্যা দুর্নাম ঘোচাবে। এখানে উৎপন্ন হয় রাজ্যের ৪০ শতাংশ ফল। সারা দেশের কাছে এই অঞ্চল potential hub of horticulture হিসেবে খ্যাতি পেয়েছে। উন্নত প্রযুক্তি নিয়ে বিনিয়োগকারীরা এগিয়ে এলে কৃষি তথা বাগিচা ক্ষেত্রটি নতুন শিল্পের দ্বার খুলে দেবে। হিমাচল প্রদেশ যেখানে রোডোডেনড্রন ফুল থেকে সাফল্যের সঙ্গে বাণিজ্যিক ভাবে নরম পানীয় বোতলজাত করছে, পশ্চিমবঙ্গ তখন সমগ্র বনাঞ্চলের উচ্চভূমিতে নষ্ট করছে এই পুষ্পের সোনালি সম্ভাবনা। ভাবছে কাশ ফুলের শিল্প সম্ভাবনা নিয়ে।

পাট, চা, তামাকের মতো ক্যাশ ক্রপ এবং আম, আনারস, কমলা ছাড়া স্বাস্থ্য পরিষেবার বিপুল সম্ভাবনাও এখানে আবিষ্কারের অপেক্ষায়। হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাঞ্চল সিকিমের মতো রাজ্যগুলো যেখানে ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্পের নতুন নতুন ইউনিট গড়ে তুলছে, পশ্চিমবঙ্গ সেখানে 'হোয়াট বেঙ্গল থিংকস্ টুডে'র আত্মশ্লাঘায় মগ্ন। প্রকৃতি এই ভূখণ্ডকে শিল্পীর তুলিতে সাজিয়েছে। দিয়েছে একাধিক অভয়ারণ্যের এবং কাজিরাঙার মতো জাতীয় উদ্যানের নৈকট্য। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটা বিরাট সংখ্যক পর্যটক কেবল সরাসরি বিমান যোগাযোগ না থাকার কারণে এইদিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

নবগঠিত তেলেঙ্গানার সরকারি ঋণের পরিমাণ ২.৮৩ লক্ষ কোটি টাকা। গত এক বছরে পরিমাণটা ১১ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও রাজ্যটি ঋণগ্রস্তদের তালিকায় দেশে শেষ পাঁচটি রাজ্যের একটি। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের স্থান প্রথম তিনে। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে কেন্দ্র থেকে পশ্চিমবঙ্গ কর রাজস্ব পেয়েছে ২১০০০ কোটি টাকা। সিকিমের পরিমাণ ৩০০০ কোটির কিছু বেশি। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বার বার বলেন পশ্চিমবঙ্গ ডেট ট্র্যাপ নয়, ডেথ ফ্ল্যাপে পড়ে গেছে। এমন একটা রাজ্যের থেকে সিকিমের মতো অর্থ সাহায্য পাওয়া দুরাশা। তাই কেন্দ্রীয় ফিসক্যাল ব্যবস্থার সুফল পেতে হলে পৃথক রাজ্য হতেই হবে।

পৃথক রাজ্য হলে উত্তরবঙ্গ সবার আগে পাবে নব রায়পুরের মতো একটা নতুন রাজধানী। রায়গঞ্জের এইমসও হয়তো দিনের আলো দেখবে। বাগডোগরা, মালদা, কোচবিহারের মতো তিন-তিনটে বিমানক্ষেত্র এবং কলাইকুণ্ডার মতো হাসিমারাতে সামরিক এয়ারোড্রোমের রাজ্য উত্তরবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী নিজের উদ্যোগে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ পেতে শিল্প সম্মেলন ডাকতে পারবেন।

আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে এক অস্থির সময়ে প্রখ্যাত সাংবাদিক ও লেখক গৌরকিশোর ঘোষ লিখেছিলেন উপন্যাস, 'পশ্চিমবঙ্গ এক প্রমোদ তরুণী'। একই সময় অধ্যাপক অশোক রুদ্র লিখেছিলেন তাঁর

কালজয়ী গ্রন্থ 'আগ্নেয়গিরির শিখরে পিকনিক'। আজকের মেট্রো-ম্যাল-মালটিপ্লেক্সের যুগে এই বঙ্গকে একটা বর্জ্য তরলে ঘেরা সুখী হাউসবোটে ভাবা যেতেই পারে। একদিকে বারোয়ারি পুজো আর গ্রাম মফস্সলে মাচার অনুষ্ঠানে চলছে টলিউড শিল্পীদের আমোদ অনুষ্ঠান, অন্যদিকে পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাটা কোমাতে চলে গেছে। প্রায় অর্ধেক মাধ্যমিক বিদ্যালয় পড়ুয়াশূন্য। বাকিগুলোতে শিক্ষক বাড়ন্ত। বিশ্ব - বিদ্যালয়গুলোতে জাল উপাচার্যদের বিচরণ। মুর্শিদাবাদের বিড়ি শ্রমিক কাশ্মীরে যাচ্ছে আপেল কুড়োতে; মালদা যাচ্ছে পরশুরামকুণ্ডে তীর্থযাত্রীদের ফেলে দেওয়া বসন কুড়োতে; দিনাজপুর চলেছে ত্রিচূড়ে দোকান কর্মচারী হতে। প্রমোদ তরণী সাগর পাড়ি দেয়, গৌরকিশোরবাবুর পশ্চিমবঙ্গ আজ এক বদ্ধ জলায় বন্দি। টাইটানিকের ডুবতে সময় লাগে। তাই উত্তরবঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ নামের জাহাজ ত্যাগ করবে নাকি ক্যাসাবিয়াঙ্কা হবে সেটা সেখানকার অধিবাসীদের আজ পছন্দের বিষয়।

আমরা যারা পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষী নাগরিক তারা দেশের বাইরে গেলে নিজেদেরকে ভারতীয় বলি। রাজ্যের বাইরে কোনো সমাবেশে সেল্ফ ইন্ট্রোডাকশনে বলি পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসেছি। কারণ সকলেই সেখানে ভারতীয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসেছি বললেই অনেকে বাংলাদেশির সঙ্গে গুলিয়ে ফেলে। কারণ পূর্ববঙ্গ বলে কিছু নেই। দেশভাগের পর আমরা যাকে পূর্ববঙ্গ বা পূর্ববাংলা বলতাম তার প্রকৃত পরিচয় ছিল পূর্ব পাকিস্তান।

পশ্চিমবঙ্গকে শুধু বঙ্গ না করে কেবল বাংলা করতে চাইছেন এখানকার মুখ্যমন্ত্রী। সেই সঙ্গে নিজের রাজ্যের জয়ধ্বনি দিতে তিনি 'জয় পশ্চিমবঙ্গ' না বলে 'জয় বাংলা' বলছেন। নেতাজীর কণ্ঠে 'জয় হিন্দ'-এর মধ্যে যেমন অখণ্ড ভারতের ছবি ভেসে উঠত, তেমনি 'জয় বাংলা' ধ্বনির মধ্যে স্বাধীন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ভেসে ওঠে। ১৯৭১-এ কলকাতার ব্রিগেডে ইন্দিরা গান্ধীকে পাশে নিয়ে মুজিবুর রহমানকে 'জয় বাংলা' ও 'জয় ভারত' বলতে শুনেছি। বিশ্বকবির বিশ্বভারতীর মতো বৃহৎ বর্ণাঢ্য সত্তার আস্বাদ না নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী গড়েছেন বিশ্ব বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়। myopic শব্দটা এখানে সুপ্রযুক্ত। অবশ্য অন্য কিছু ক্ষেত্রে তিনি বঙ্গ বিরোধী নন, যেমন রাজ্যের লোগোতে ব, কিংবা বিশ্ব বঙ্গ সরণি।

আমাদের মজ্জায়, ভাবনায়, বিশ্বাসে অভ্যাসে এই 'বাংলা' শব্দ সম্পর্কে একটা প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা মিশে আছে। সেটা আমরা মানি বা না মানি। স্বাধীনতার আগে যে সব স্কুলে ইংরেজি ছিল না তাদের বাংলা স্কুল বলা হতো। নীচু ডালার যে লরিগুলোতে ইট বালি বা কর্পোরেশনের জঞ্জাল নিয়ে যাওয়া হয় সেগুলোকে বাংলা ডালা বলে। এমনকী খালাসিটোলায় পরিবেশিত পানীয়টির সঙ্গেও বাংলার যোগ আছে।

আজকের পশ্চিমবঙ্গের জন্মের মধ্যে যে পূর্ববঙ্গের ইতিহাস বর্তমান সেটা জানানোর জন্যই কেন্দ্রীয় সরকার নাম বদলের বিরোধী। এটা যুক্তি হিসেবে দুর্বল। এটা পার্ক স্ট্রিটের বা কার্জন পার্কের নাম বদল নয়। নামকরণ একটি সুচিন্তিত দর্শনকে মান্যতা দেয়। ইংরেজরা সেই সব পথ বা স্থানের নতুন নাম দিত যেগুলো তারা নিজেরা গড়েছিল। হঠাৎ হঠাৎ নাম বদল অপরিণত চিন্তার প্রকাশ। পশ্চিমবঙ্গ কেবল বঙ্গ হলে ইতিহাসের বিকৃতি হবে না, কারণ মহাকাব্যে বঙ্গকে পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে নতুন রাজ্য উত্তরবঙ্গ বা গৌড়বঙ্গ সুসঙ্গত হবে। এলিট বাঙ্গালি ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ না চাইলেও গঙ্গা-পদ্মার জল ঘোলা করে ১৯৪৭-এ সেই প্রস্তাব গলাধঃকরণ করেছে। এবার বোধহয় মহানন্দার জল পান করে নতুন রাজ্যের অভিষেক ঘটতে চলেছে।

পল্লিকবি জসিমউদ্দিন বা বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান হয়ে জন্মে মাঝে কয়েকবছর পাকিস্তানি পরিচিতি নিয়ে শেষে বাংলাদেশি হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ভবিষ্যতে উত্তরবঙ্গ তৈরি হলে শিলিগুড়ির গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য বা কুমারগ্রামের শালিব টোপ্পো কলকাতার কুণাল চট্টোপাধ্যায়ের চেয়ে কম বাঙ্গালি হয়ে যাবে না, ভারতীয়ই থাকবে এবং ভারতীয় পাসপোর্টই বহন করবে।

সার্ভান্তেস বলেছিলেন সম্মানের জন্য সংগ্রাম করো। যদি নির্যাতন জোটে সহ্য করো। অন্যদিকে সাঙ্কোর সাবধানী উপদেশ— প্রভুকে মান্য করো। বেশি জিনিস নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না। মারের ভয়টা মনে রেখো।

আনাতোল ফ্রাঁস বলেছেন— 'সাঙ্কোর কথাই আমরা বেশি শুনি'। পৃথক উত্তরবঙ্গের প্রশ্নে আনাতোল ফ্রাঁসের করাটাই ক্রমশ সত্য হয়ে দেখা দিচ্ছে এবং পিছিয়ে যাচ্ছে নববঙ্গের জন্ম। □

শোকসংবাদ

গত ১০ জুন, বেহালার প্রবীণ স্বয়ংসেবক ডাক্তার অধীর কুমার মুখার্জি ৭২ বছর বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অধীরদা (টুনুদা) ১৯৪৬ সালে বেহালায় সঙ্ঘকাজ শুরু হওয়ার প্রথম দিন থেকেই স্বয়ংসেবক। ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থার প্রতিবাদে সত্যাগ্রহ করে অন্য স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে আলিপুর জেলে আড়াই মাস কারাবন্দি ছিলেন। পেশায় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক অধীরদা বেহালার সঙ্ঘের বিভিন্ন দায়িত্ব দক্ষতার সঙ্গে পালন করেছেন। এছাড়া জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সাংস্কৃতিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বেহালা বিবেকানন্দ পাঠচক্রের সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-সহ পরিবারের জন্য সদস্যরাও সঙ্ঘকাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

* * *

নদীয়া জেলার রানাঘাটের দে চৌধুরী পাড়ার সঙ্ঘের মিলন প্রমুখ এবং স্বস্তিকা প্রচার প্রতিনিধির মা সবিতা কর্মকার গত ৯ জুন, ২০২৩ তারিখে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। তিনি তাঁর ৩ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

কুড়ি জুন

পশ্চিমবঙ্গের জন্মদিন

ড. বাবুলাল বালা

ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর মাউন্টব্যাটেন ১৯৪৭ সালের ৩ জুন ভারত বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গ ও পঞ্জাব ভাগের পরিকল্পনা প্রকাশ করেন যা কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ মেনে নেয়। মাউন্টব্যাটেনের ভারত বিভাগের বিধানে একটি শর্ত ছিল— বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভার অনুমোদন সাপেক্ষ সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, অবিভক্ত বঙ্গপ্রদেশ ভারতে যোগদান করবে, না পাকিস্তানে যোগদান করবে, নাকি বঙ্গ বিভক্ত হবে।

উল্লেখ্য, ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্টের কলকাতা নরসংহার, অক্টোবর মাসের নোয়াখালির একতরফা হিন্দু হত্যার আবহে তৎকালীন অবিভক্ত বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী সোহরাওর্দির সঙ্গে শরৎচন্দ্র বসু, কিরণ শঙ্কর রায়, যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল প্রমুখ নেতৃত্ব ভারত বা পাকিস্তান কোনোটাতেই যোগদান না করে 'স্বাধীন সার্বভৌম বঙ্গ' গঠনের পক্ষে জোরদার প্রচার শুরু করেন।

সোহরাওর্দির পরিচালনায় মুসলিম লিগের নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদতে মুসলমান গুন্ডারা 'কলকাতা নরসংহার' থেকে শুরু করে 'নোয়াখালির দাঙ্গা' ও অন্যান্য ক্ষেত্রে যেভাবে হিন্দুদের হত্যা, হিন্দু সম্পত্তি লুণ্ঠন, হিন্দু নারী ধর্ষণ ও বলপূর্বক ধর্মান্তরণের মতো অপরাধ সংঘটিত করেছিল; তাতে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অখণ্ড বঙ্গ অদূর ভবিষ্যতে পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হলে হিন্দুদের জীবন ও ধর্ম যে ভয়ংকর ভাবে বিপন্ন হবে তা বুঝতে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বহু হিন্দু বাঙ্গালি নেতার অসুবিধা হয়নি। দেশভাগের সঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়াবহ পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীজীর কলকাতায় অবস্থানকালে, সোহরাওর্দি শরৎচন্দ্র বসুকে নিয়ে 'স্বাধীন-সার্বভৌম বঙ্গদেশ' গঠনের জন্য গান্ধীজীর আশীর্বাদ চাইতে গেলে গান্ধীজী শ্যামাপ্রসাদকে ডেকে পাঠান। শ্যামাপ্রসাদ শান্তকণ্ঠে গান্ধীজীকে বলেন 'সোহরাওর্দিকে আপনি বলুন যে তিনি আপনার কাছে এই মর্মে লিখিত দলিল দিন— Independent Sovereign Bengal shall never acceded to Pakistan' অর্থাৎ 'স্বাধীন-সার্বভৌম বঙ্গ' কখনওই পাকিস্তানে যোগ দেবে না।' গান্ধীজী সোহরাওর্দিকে শ্যামাপ্রসাদের প্রস্তাবের জবাব দিতে বললে সোহরাওর্দি ওই রকম 'দলিল' দিতে অস্বীকার করেন।

দেশের এরূপ সঙ্কটকালীন সময়ে হিন্দুমহাসভার নেতা ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী হিন্দুদের জীবন ও ধর্মের সুরক্ষার কথা ভেবে দ্বিখণ্ডিত করে বঙ্গ পশ্চিমাংশের হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলিকে নিয়ে 'পশ্চিমবঙ্গ' প্রদেশ গঠন করে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করে দলমত নির্বিশেষে সেদিন বাঙ্গলার বিশিষ্টজনেরা বিশেষভাবে ড. মেঘনাথ সাহা যদুনাথ সরকার, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রমুখের সমর্থনের সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসও ড. শ্যামাপ্রসাদের দাবির যথার্থতা উপলব্ধি করলে বঙ্গভাগ করে পশ্চিমবঙ্গকে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করার প্রেক্ষাপট তৈরি হয়।

এরূপ পটভূমিকায় মাউন্টব্যাটেনের ভারত বিভাগের বিধান অনুযায়ী পাকাপাকিভাবে বঙ্গের ভাগ্য নির্ধারণের জন্য অবিভক্ত বঙ্গপ্রদেশের আইনসভার শেষ অধিবেশন বসে ১৯৪৭ সালের ২০ জুন। উল্লেখ্য, 'Bengal Legislative Assembly'-র ২৫০ জন সদস্যের মধ্যে সেদিন আইনসভায় উপস্থিত ছিলেন ২২০ জন। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল মুসলিম লিগের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে কেন্দ্রীয় অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদান করায় তাঁর আসনটি ফাঁকা ছিল। ২৫ জন ইউরোপীয় সদস্যের সকলেই সেদিন অনুপস্থিত ছিলেন। এ.কে. ফজলুল হক ও তাঁর একান্ত অনুগামী মৌলানা শামসুল হুদা ইচ্ছে করেই সেদিন আইন সভায় অনুপস্থিত থাকেন। রংপুরের কংগ্রেস সদস্য রজনীকান্ত রায়বর্মন অসুস্থতার কারণে এবং অপর কংগ্রেস সদস্য জে.সি. গুপ্ত বিদেশে থাকার কারণে অনুপস্থিত থাকেন।

১৯৪৭ সালের ২০ জুন সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সদস্যদের আধিপত্যাধীন অবিভক্ত বঙ্গীয় আইনসভার শেষ অধিবেশন ১২৬-৯০ ভোটে পাকিস্তানে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু বর্ধমানের মহারাজা উদয়চাঁদ মহতাবের সভাপতিত্বে বঙ্গের পশ্চিমাংশের হিন্দু সংখ্যগরিষ্ঠ জেলাগুলির আইনসভার সদস্যরা আলাদাভাবে ৫৮-২১ ভোটের ব্যবধানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে হিন্দুদের সুরক্ষার জন্য বঙ্গকে বিভক্ত করে 'পশ্চিমবঙ্গ' প্রদেশ গঠন করে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। অন্যদিকে, বিধানসভার তৎকালীন স্পিকার নূরুল আমিনের সভাপতিত্বে বঙ্গের পূর্বাংশের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলির আইনসভার সদস্যরা ১০৬-৩৫ ভোটের ব্যবধানে বঙ্গবিভাগের বিরোধিতা করলেও শেষ পর্যন্ত খণ্ডিত পূর্ববঙ্গ নিয়ে পাকিস্তানে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এইভাবে ভারত কেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় অবিভক্ত বঙ্গপ্রদেশের আইনসভার শেষ অধিবেশনে ভোটাভুটির মাধ্যমে ১৯৪৭ সালের ২০ জুন পশ্চিমবঙ্গের জন্ম হয়। মনে রাখতে হবে, ভারত তথা বঙ্গভাগের পর পাকিস্তানে হিন্দুদের ওপর আক্রমণের ফলে হিন্দুরা বাধ্য হচ্ছে জীবন-ধর্ম ও মা-বোনেদের সম্মান বাঁচাতে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে। সেদিন যদি ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী 'Hindu Homeland' হিসেবে 'পশ্চিমবঙ্গ' গঠনের প্রয়াস না করতেন তবে আজ সাবেক পূর্বপাকিস্তান তথা অধুনা বাংলাদেশ থেকে অত্যাচারিত ও বিতাড়িত হিন্দুরা কোথায় গিয়ে দাঁড়াতেন?

শতাব্দীপ্রাচীন গীতা প্রেসকে গান্ধীশান্তি সম্মাননা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের ঘোষণা অনুযায়ী ২০২১-এর গান্ধীশান্তি পুরস্কারে ভূষিত হতে চলেছে 'গীতা প্রেস'। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন জুরিপর্ষদ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। শান্তি ও সামাজিক মৈত্রী স্থাপনে গান্ধীজীর আদর্শের পথে পরিচালিত হয়ে গীতা প্রেসের সামাজিক ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতি রূপে এই পুরস্কার প্রদান করা হলো। গোরক্ষপুর হতে প্রকাশিত গীতা প্রেসকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী গত এক শতাব্দী ধরে দেশের মধ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনার জন্য গীতা প্রেসের ভূমিকার প্রশংসা করেন। ১৯৯৫ সালে মহাত্মা গান্ধীর ১২৫তম জন্মজয়ন্তীতে ভারত সরকার এই সম্মাননা প্রদান চালু করে। গান্ধীজী প্রদর্শিত অহিংসা ও অন্যান্য পদ্ধতি অনুসরণ করে দেশের সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক পরিসরে সংস্কার আনয়নের ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ এই পুরস্কারের সঙ্গে গীতা প্রেসকে তুলে দেওয়া হবে একটি মানপত্র, একটি সম্মান-বলয়, একটি দেশীয় হস্তশিল্প সামগ্রী ও ১ কোটি টাকা মূল্যের অর্থরাশি। ১৯২৩ সালে প্রতিষ্ঠিত গীতা প্রেস থেকে এখনও অবধি ৪১.৭ কোটি বইয়ের কপি প্রকাশিত হয়েছে, যার মধ্যে ১৬.২১ কোটি শ্রীমদ্ভগবত গীতা। হিন্দুধর্মের আকর গ্রন্থ-– গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, সন্তদের জীবনচরিত ও অন্যান্য চরিত্র গঠনকারী বই ও পত্রিকা প্রকাশ এবং ন্যায্য মূল্যে সেগুলি সরবরাহের মাধ্যমে মহান নীতি-আদর্শের প্রচারই এই সংস্থার অভীষ্ট লক্ষ্য। দেশ, জাতি, বর্ণ, ধর্ম, সম্প্রদায়, ভাষা ও লিঙ্গ নির্বিশেষে ভারত সরকার এই সম্মান প্রদান করে থাকে।

রেলকর্মী সপরিবারে পলাতক

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ওড়িশার সোরো রেলওয়ে সেকশনের সিগন্যাল জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার আমির খান সপরিবারে পলাতক। করমণ্ডল দুর্ঘটনার তদন্তভার সিবিআই নেওয়ার পর সিবিআইয়ের আধিকারিকেরা আমির খানকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন। তার পরদিন, আধিকারিকেরা যখন আমির খানের সোরোর ভাড়া বাড়িতে যান তখন দেখা যায় দরজায় তালা ঝুলছে। পুরো পরিবারই পলাতক। সিবিআই বাড়ি সিল করে দেয়।

প্রশ্ন উঠছে, কী এমন ঘটল যে আমির খানকে সপরিবারে পালিয়ে যেতে হলো? রেল চলাচলে জুনিয়র সিগন্যাল ইঞ্জিনিয়ারের ভূমিকাটাই-বা কী? বিশেষজ্ঞদের মতে, সিগন্যালিঙের যাবতীয় যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ এবং কিছু খারাপ হয়ে গেলে তা সারাবার পুরো দায়িত্বই একজন জুনিয়র সিগন্যাল ইঞ্জিনিয়ারের। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রেল কর্তৃপক্ষ বারবার বলে আসছেন, করমণ্ডল দুর্ঘটনার জন্য দায়ী ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং সিস্টেমে অযাচিত হস্তক্ষেপ।

টাইমস অব ইন্ডিয়া খুর্দার ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার রিঙ্কেশ রায়কে উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, সমস্ত শর্ত পূর্ণ করতে পারলেই ট্রেন ছাড়ার সবুজ সংকেত দেওয়া হয়। সামান্যতম সন্দেহও যদি থাকে তাহলে সিগন্যাল লাল হয়ে যাবে। একমাত্র নাশকতার উদ্দেশ্য নিয়ে কেউ কাজ করলেই প্রযুক্তিগত সমস্যা থাকা সত্ত্বেও সিগন্যাল সবুজ হতে পারে। এখন আমির খান এরকম কোনও নাশকতামূলক পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কিনা সেটাই খতিয়ে দেখছে সিবিআই।

২৩০০ বছরের প্রাচীন বৌদ্ধ ভাস্কর্য উদ্ধার ওড়িশাতে

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ওড়িশার পুরী জেলায় দয়া নদীর তীরে খননকার্য কালে প্রায় ২৩০০ বছর প্রাচীন একটি হস্তী মূর্তি পাওয়া গেছে। তিন ফুট (১ মিটার) উচ্চতা বিশিষ্ট পাথর কেটে তৈরি এই মূর্তিটির সঙ্গে বৌদ্ধ যুগের অন্যান্য হস্তীমূর্তি সমূহের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ট্রাস্ট ফর আর্ট অ্যান্ড কালচারাল হেরিটেজ (INTACH)-এর অধীন পুরাতাত্ত্বিকদের একটি দল ঐতিহাসিক অনিল ধীরের নেতৃত্বে ওড়িশাতেই খননকাজ চালায়। প্রাচীন যুগে এই দয়া নদীর উপত্যকায় বৌদ্ধধর্ম বিকাশ লাভ করে। এই স্থানের বিভিন্ন গ্রাম থেকে খননকাজের ফলে একাধিক প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এবং একটি বৌদ্ধ মন্দির-সহ অন্যান্য স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার হয়েছে। ধৌলগিরি (ধৌলি)-তে প্রাপ্ত হস্তী মূর্তির অনুরূপ এই মূর্তিটি। খননকার্যস্থল হতে ধৌলির দূরত্ব নদীর উৎস অভিমুখে ১২ মাইল (১৯ কিমি)। ঐতিহাসিক ধীরের মতে এই মূর্তিটি নির্মাণের আনুমানিক সময়কাল ২৭২---২৩১ খ্রিস্টপূর্বাব্দ।

বৌদ্ধধর্মে হস্তীর তাৎপর্য : নেপালের কপিলাবস্তুর প্রাচীন কিংবদন্তী ও গবেষণালব্ধ তথ্য অনুসারে শাক্য রাজবংশের রানি মায়া গর্ভবতী হওয়ার শুরুতেই বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর গর্ভের সন্তানটি হতে চলেছে অনন্যসাধারণ। রানি মায়া স্বপ্নে দেখেন যে ছয়দন্ত বিশিষ্ট একটি

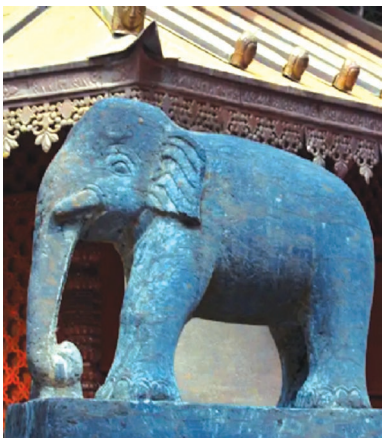

শ্বেত হস্তী গর্ভধারণকালে তাঁর শরীরের ডানদিকে প্রবেশ করছে। সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যানুযায়ী তাঁর গর্ভের সন্তানটি হতে চলেছে বিশ্ব শাসনকর্তা বা একজন বোধিপ্রাপ্ত বুদ্ধ। এবং তারপরেই তিনি সিদ্ধার্থের জন্ম দেন যিনি কালক্রমে পরিচিত হলেন ভগবান গৌতমবুদ্ধ রূপে। বিভিন্ন বৌদ্ধপুঁথি ও জাতক কাহিনি অনুযায়ী, ভগবানবুদ্ধ তাঁর পূর্বজন্মে হস্তী রূপেও জগতে অবতীর্ণ হন। এবং এই কিংবদন্তী সমূহের উল্লেখ বিশ্বজুড়ে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে হস্তীর তাৎপর্যের যোগসূত্রকে ব্যাখ্যা করে।

With best compliments from -

A

Well Wisher

মণিপুরে শান্তি স্থাপনে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের আবেদন

মণিপুরে গত ৪৫ দিন যাবৎ ক্রমাগত অশান্তি ও হিংসার পরিস্থিতি চরম উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত ৩ মে, ২০২৩ চূড়াচাঁদপুরে স্থানীয় লাই-হারাওবা উৎসব চলাকালীন সংঘটিত এক প্রতিবাদ মিছিল থেকে রাজ্য জুড়ে ছড়িয়ে পড়া হিংসা ও অস্থিরতা খুবই নিন্দনীয়। বহু শতাব্দী ধরে এখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শান্তি - সৌহার্দ্যপূর্ণ সহাবস্থান, পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সহযোগিতার দীর্ঘ ইতিহাস সত্ত্বেও মানুষজন যে এই দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছেন তা দুর্ভাগ্যজনক।

হানাহানির এইপরিস্থিতিতে, উচ্ছেদ হওয়া ও হিংসার শিকার অসহায় মণিপুরবাসীর পাশে সঙ্ঘ দাঁড়িয়েছে। আলোচনার মাধ্যমে এই সমস্যার একটা গ্রহণযোগ্য সমাধান সূত্র সন্ধানে সঙ্ঘ আস্থা রাখে। হিংসা আক্রান্ত ৫০ হাজারেরও বেশি মানুষের পাশে থেকে সঙ্ঘের উপলব্ধি যে এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় হিংসার কোনো স্থান নেই। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নিরন্তর আলাপ-আলোচনা ও সৌভ্রাতৃত্বের মাধ্যমেই এর সমাধান সম্ভব।

অসহায় মৈতেই ও নানা সমস্যায় জর্জরিত কুকি — উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব ও নিরাপত্তাহীনতার সমাধানে একযোগে প্রয়াসের জন্য সঙ্ঘ সকলের কাছে আবেদন জানাচ্ছে।

সরকার, রাজ্যের স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ, সেনাবাহিনী ও কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির প্রতি সঙ্ঘের অনুরোধ যে , এই হিংসা বন্ধে অবিলম্বে চূড়ান্ত তৎপরতা গ্রহণ করা হোক এবং ঘরছাড়া জনতার জন্য ত্রাণসামগ্রী সরবরাহ সুনিশ্চিত করার পদক্ষেপের মাধ্যমে আঞ্চলিক শান্তি ও সহাবস্থানের পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনা হোক।

নাগরিক সমাজ, রাজনৈতিক দল ও সাধারণ জনতাকে সচেতন হয়ে এগিয়ে এসে মণিপুরকে হিংসামুক্ত করার লক্ষ্যে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করে রাজ্যবাসীর নিরাপত্তা ও রাজ্যে শান্তি স্থাপনের জন্য সঙ্ঘ আবেদন জানাচ্ছে।

দত্তাত্রেয় হোসবালে
সরকার্যবাহ

।। চিত্রকথা।। মহামানব মহানামব্রত।। ৫০।।

১৯৭৩ সালে ঢাকায় জগদ্বন্ধু মহাপ্রকাশ মঠে তাঁর সভাপতিত্বে বিশাল সমাবেশ হলো।

কলকাতায় দেশপ্রিয় পার্কে দোলপূর্ণিমায় শ্রীচৈতন্য আবির্ভাব তিথির বিশাল জনসমাবেশে সভাপতির ভাষণ দিয়েছিলেন ড: মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজী। মঞ্চে ছিলেন মা আনন্দময়ী, ওঙ্কারনাথ ঠাকুর, স্বামী স্বরূপানন্দ, তুষার কান্তি ঘোষ প্রমুখ।

(ক্রমশ)